গণেশ ঠাকুরের গল্প

শিশু সাহিত্য সংসদ

গণেশ ঠাকুরের গল্প

গণেশ ঠাকুরের গল্প

লেখা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়   ছবি : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ

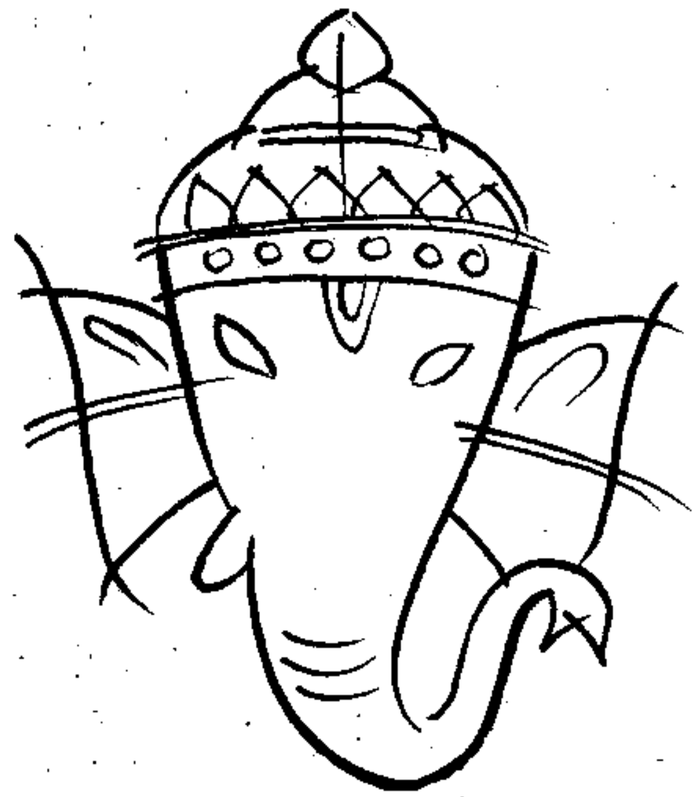

GANESH THAKURER GALPA *(Stories of Lord Ganesha)* by Hiren Chattopadhyay

ISBN : 81-7955-174-1 © প্রকাশক **প্রথম প্রকাশ** : জানুয়ারি ২০০৯ **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : নটরাজ অফসেট ১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪

INR : 75.00

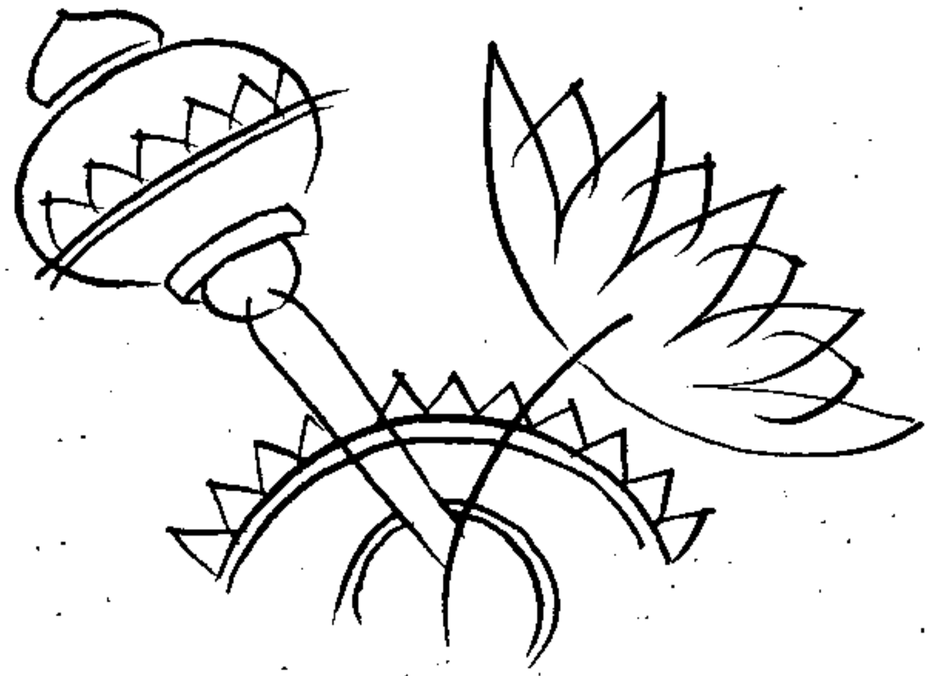

প্রকাশকের কথা

ভারতবর্ষ বেদ-পুরাণের দেশ। এদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব অধিবাসীদের চিন্তায়-চিন্তনে এদের প্রভাব। আজ থেকে নয়, পৌরাণিক যুগ থেকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাদের নিজস্ব পুরাণকাহিনির ট্র্যাডিশন আছে। সে-সব দেশের মানুষদের ওপরও তাদের পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট। এমনকী আধুনিক সাহিত্যেও ওইসব পুরাণকাহিনির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

তাই সংসদের পুরাণকাহিনির সিরিজ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে *শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্প*, তারও আগে প্রকাশিত হয়েছিল গৌরী ধর্মপালের *উপনিষদের গল্প*। আমাদের প্রকাশিত এসব বইয়ের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে পাঠকমহলে পুরাণসাহিত্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। এই আগ্রহের চাহিদা পূরণই আমাদের প্রয়াস। *গণেশ ঠাকুরের গল্প* এই উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হবে বলেই আশা করি।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০৯

দেবজ্যোতি দত্ত

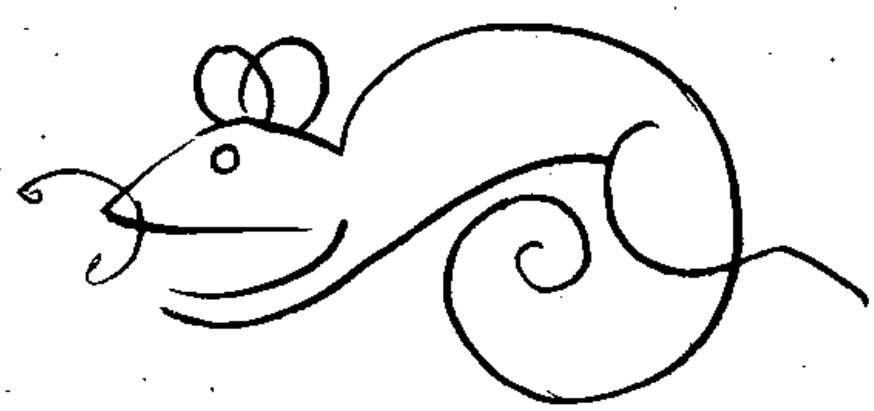

সূচি

জবর ঠাকুর গণেশ ঠাকুর ০৯

গণেশ ঠাকুরের নানারূপ ১১

গণেশ ঠাকুরের জন্ম ১৫

গণেশের কেন হাতির মুণ্ডু ২১

গণেশ কেন একদন্ত ২৩

গণেশের গায়ে সাপ কেন ২৬

গণেশ ঠাকুর পরম জ্ঞানী ২৮

গণেশ ঠাকুর চোর না কি ৩০

যেমন ঠাকুর তেমনি বাহন ৩১

গণেশ ঠাকুরের বিয়ে ৩৩

গণেশের গল্প ফুরোল ৩৬

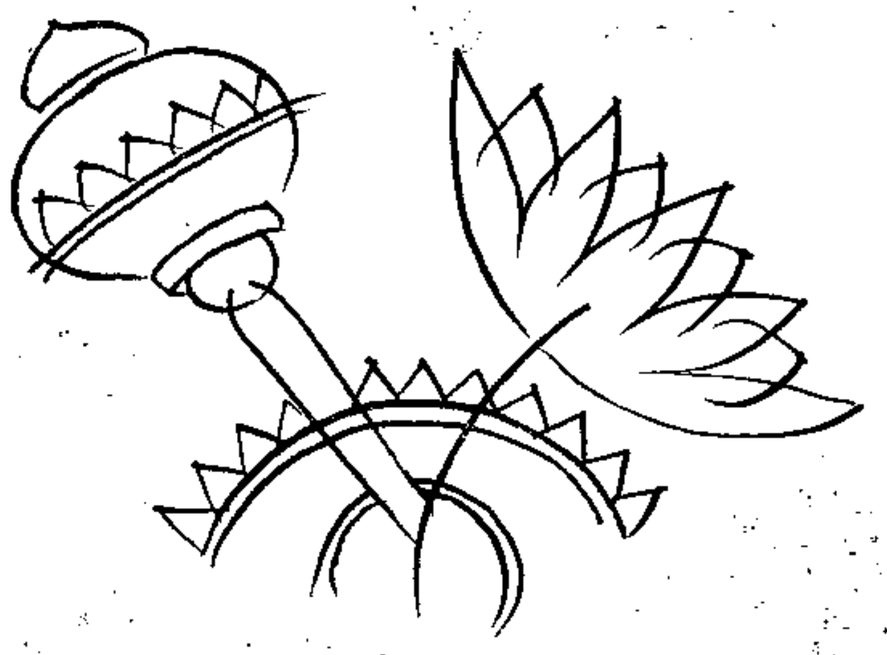

কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে

ঋগ্বেদ / শুক্ল যজুর্বেদ / অথর্ববেদ / মৎস্যপুরাণ / অগ্নিপুরাণ / সৌধপুরাণ / ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ / বরাহপুরাণ / কালিকাপুরাণ / স্কন্দপুরাণ / বামনপুরাণ / শৈবপুরাণ

হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব) — হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

দেবদেবী ও তাঁদের বাহন — স্বামী নির্মলানন্দ

মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

জবর ঠাকুর গণেশ ঠাকুর

জবর ঠাকুরই বটে। গণেশঠাকুর সকলের ঠাকুর। বাচ্চারা পর্যন্ত ঠাট্টা করে বলে— গণেশদাদা পেটটি নাদা, ছোলা খায় গাদা গাদা। ঠাট্টা করবে নাই বা কেন, চেহারাখানাই তো এমন যে দেখলেই হাসি পায়— বেঁটেখাটো গোলগাল, মুলোপানা দাঁত কুলোপানা কান আর ওই রক্তবর্ণ চেহারা। অথচ এই কথাগুলোই যদি সংস্কৃত ভাষায় বলা হত, তাহলেই সেটা গণেশ ঠাকুরের ধ্যান হয়ে যেত। যেমনি বেঢপ দেবতা, তেমনি অদ্ভুত তাঁর বাহন ইঁদুর।

বাহন ওই ইঁদুর, আর দেখতে অমন হলেও ঠাকুরটিকে কিন্তু তুচ্ছ করার জো নেই, সবকিছুর সিদ্ধিদাতা হচ্ছেন গণেশ। যে-কোনো পুজো করতে গেলেই গণেশ ঠাকুরের মন্ত্র বলতে হবে আগে, যে-কোনো কাজ আরম্ভ করলে, গণেশ ঠাকুরকে স্মরণ করতে হবে প্রথমে, আবার ব্যাবসাপত্র করতে গেলেও সবচেয়ে আগে প্রণাম করতে হবে গণেশ ঠাকুরকেই। দেবদেবীদের নিয়ে বাংলায় যেসব মঙ্গালকাব্য লেখা হয়েছে সব কটারই প্রথমে ছিল গণেশ-বন্দনা। সব বেদ-পুরাণও বলছে ইনি একেবারে দেবতাদেরও দেবতা, দেবতাদের গণপতি।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ইনি কবিদের মধ্যেও সেরা কবি, জ্ঞানীদের মধ্যেও সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী, কীর্তিমানদের মধ্যেও সবার সেরা কীর্তিমান। বিভিন্ন বেদে তাঁর নানারকমের স্তুতি, পুরাণগুলোও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এসব বইয়ে বলা হয়েছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করবার জন্যে নিজের মুখ থেকে তৈরি করেছিলেন রুদ্রকে, সেই রুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন নিজের মতো আরও অসংখ্য রুদ্র। তাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গণেশ বা গণপতি।

গণেশ ঠাকুরের নাম গণপতি হল কেমন করে! এ ব্যাপারে নানামুনির নানা মত। ঋগ্বেদের মুনিরা বলছেন, বৃহস্পতি আর ব্রাহ্মণস্পতিই হচ্ছেন গণপতি। এঁরা দুজনে আসলে গণেশেরই অন্যরূপ। বৃহস্পতি হল দেবগুরু, আর ব্রাহ্মণস্পতি হল সূর্য দেবতা। কেউ কেউ বলেছেন গণেশ রুদ্রদের মধ্যে সেরা, তাই তিনি গণপতি।

গণের অনেক মানে আছে! গণ বলতে মহাদেবের অনুচরদেরও বোঝায়, তাদের বলা হয় বিনায়ক। মজার কথা, গণেশেরও আর এক নাম বিনায়ক— এখানে তো বটেই, ভারতবর্ষের বাইরে জাপানে তাঁর এই নামটাই চলে বেশি।

নাম অবশ্য গণেশ ঠাকুরের প্রচুর। মাথাটা হাতির মুণ্ডু বলে নাম হল গজানন। হাতির থাকে দুটো দাঁত কিন্তু গণেশের আছে একটা, তাই নাম হল একদন্ত। কার্তিকের অন্য নাম গুহ, তিনি তাঁর বড়ো ভাই, তাই নাম হল গুহাগ্রজ। কুলোর মতো কান, কুলোর এক নাম সূর্প, তাই গণেশ ঠাকুরের নাম হল গিয়ে সূর্পকর্ণ। নিজের বীরত্ব নিয়ে নিজেরই বড়ো গর্ব, তাই নাম হল হেরম্ব। সমস্ত বাধাবিঘ্ন নাশ করে দেন, তাই নাম হল বিঘ্নেশ। তাঁকে একবার স্মরণ করলে সব কাজে সিদ্ধিলাভ হয়, নাম তাই তাঁর সিদ্ধিদাতা। কার্তিকের মতো তাঁরও মাঝে মাঝে ময়ূরে চড়তে ইচ্ছে করে, তাই তাঁর নাম ময়ূরপাল বা ময়ূরেশ। নামের কি আর শেষ আছে— বিঘ্নরাজ, দ্বৈমাতুর, চারুপাল, পশুপাল, লম্বোদর, লিপীশ্বর, পঞ্চপাণি, পঞ্চবক্ত্র, আরও কত কী!

আমাদের কাছে গণেশ ঠাকুরের বড়ো পরিচয়, তিনি মা দুর্গার বড়ো ছেলে। মা দুর্গা যখন আসেন, তখনই তাঁর রমরমা। আলাদা করে এখানেও অবশ্য গণেশপুজো হয় কোথাও কোথাও, কিন্তু সেরকম একটা ঘটা করে আলাদা পুজো হয় না। সেটা হয়

ওড়িশায়, আর সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে। দক্ষিণ ভারতেও গণপতি পুজোর বেশ ঘটা, তবে মহারাষ্ট্রের মতো এমন মাতামাতি বোধ হয় আর কোথাও হয় না। গণেশ ঠাকুরের জন্মদিন নাকি ভাদ্রমাসের চৌঠা তারিখ, তাই প্রতিবছর এই দিনই ওড়িশা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র সব জায়গায় বিশেষ গণেশ-উৎসব হয়। মন্দিরে আর বাড়িতে পুজোর ঘটা তো আছেই, বারোয়ারি দুর্গাপুজোর মতো মহারাষ্ট্রে হয় সর্বজনীন গণেশপুজো।

গণেশপুজো যে শুধু আমাদের দেশেই হয় তা কিন্তু নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও কত জায়গায় যে গণেশ ঠাকুর দাপটে রাজত্ব করছেন, ভাবলে অবাক লাগে। নেপাল, তিব্বত, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, জাভা, বোর্নিও, বালিদ্বীপ, এমনকী চীন আর জাপানেও গণেশ ঠাকুরটির প্রবল প্রতাপ।

চীনের কুংসিনে প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো বুদ্ধমন্দিরে পাওয়া গিয়েছে গণেশের মূর্তি, তবে তাঁর নাম সেখানে শো-তেন। জাপানে গণেশঠাকুরের অনেক নাম— শো-তেন, গণবচি, বিনায়ক-তেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিচিত তিনি কঞ্জি-তেন নামে।

গণেশ ঠাকুরের কতরকম মূর্তি যে পাওয়া যায় তার ঠিকঠিকানা নেই। বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষ গণেশের নানা রকমের মূর্তি বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছেন। দেবতাদের তো মোটামুটি একরকম চেহারাই আমরা দেখি, গণেশ ঠাকুরের এত রকমের মূর্তি কেন পাওয়া যায়, মূর্তিগুলো ঠিক কীরকম সেটাই বরং এবার জানার চেষ্টা করা যাক।

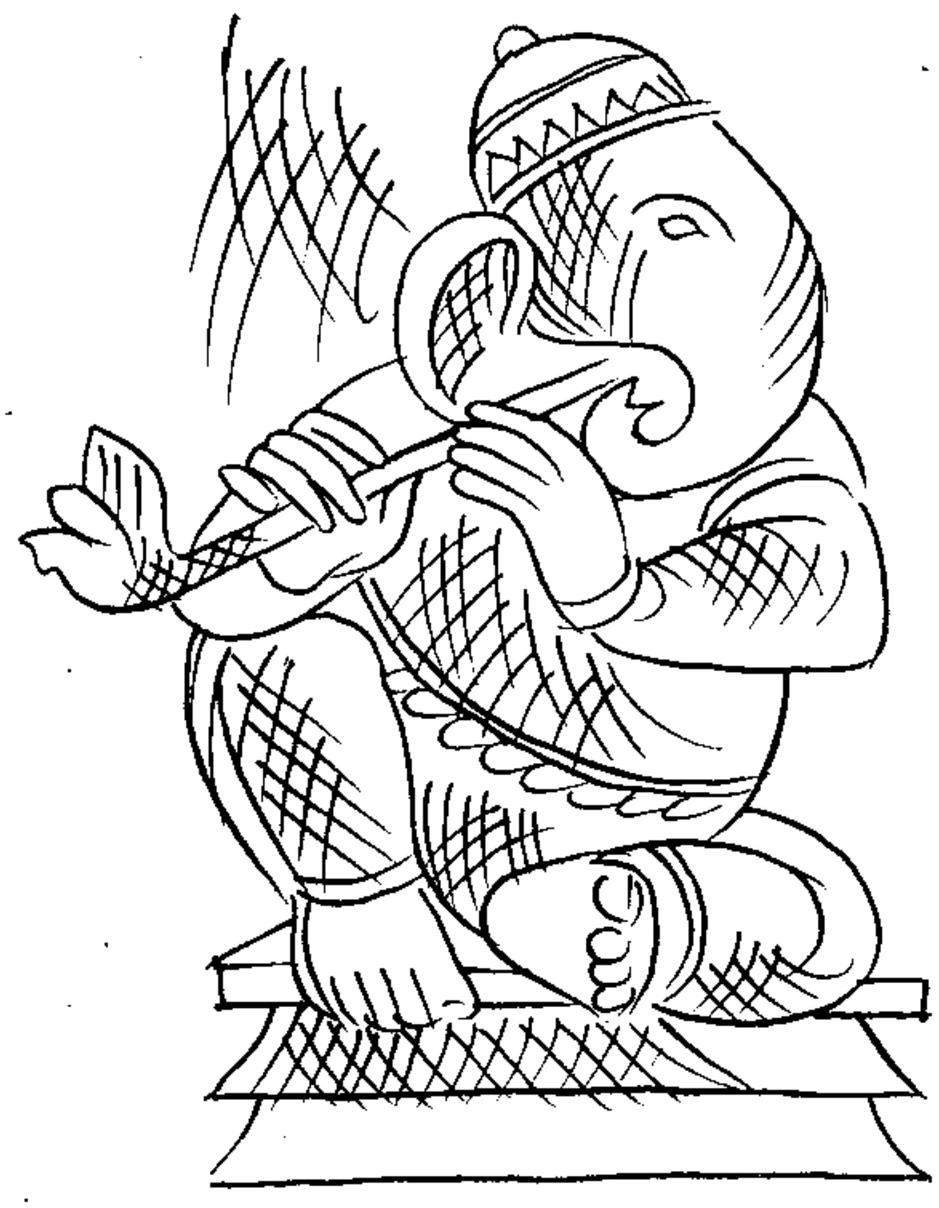

গণেশ ঠাকুরের নানারূপ

গণেশ ঠাকুরের যেসব মূর্তি আমরা আজ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি তা মোটামুটি তিন রকমের— দাঁড়ানো মূর্তি, বসা মূর্তি, আর গণেশ ঠাকুর নাচছেন এইরকম মূর্তি। গণেশের দাঁড়ানো মূর্তি পাওয়া গেছে কম, কিন্তু বসে থাকা আর নাচের মূর্তি পাওয়া গেছে অনেক। চার হাতওয়ালা গণেশের মূর্তিই পাওয়া যায় বেশি, তুলনায় দু-হাতওয়ালা মূর্তিই কম; কিন্তু আরও বেশি হাত আছে এমন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে, ষোলোটি হাত আছে এমন মূর্তিও খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরাণে গণেশের নানারকম বর্ণনা, সেই সঙ্গে আবার যে-রকম নাম সে-রকম চেহারার বর্ণনাও আছে। ফলে, ওই একই ঠাকুর যে কতরকম চেহারায় দেখা দিয়েছেন সে আর বলার কথা নয়। একটা পুরাণে গণেশের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখি, গণেশ ঠাকুরের বিরাট চেহারা, তেমনি ভুঁড়ি, কাঁচা সোনার মতো রং, টানা টানা চোখ। পরণে তাঁর কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া, গলায় সাপের পৈতে, মাথায় চন্দ্রকলা, হাতে পাশ আর অঙ্কুশ। বলা হয়েছে, এ হল গণনায়কের মূর্তি।

অন্য পুরাণে আছে গণেশের বিনায়ক মূর্তি। হাতির মতো মুখ, বিরাট ভুঁড়ি, তিনটে চোখ আর চারটে হাত। ওপরের ডানহাতে তাঁর পানপাত্র, তার নীচের হাতে পদ্ম; ওপরের বাঁ-হাতে লাড্ডু, তার নীচের হাতে কুঠার। এই গণেশের একটি দাঁত, কুলোর মতো কান আর পৈতে এখানেও সাপ।

আর একটি পুরাণে দেখছি, গণেশের নাম গণপতি, গণধিপ, গণনায়ক আর গণেশ। সেখানে খেলাধুলো করছেন সকলের সঙ্গে। তাঁর গায়ের রং ধোঁয়ার মতো, একটি দাঁত, শুঁড়টি একদিকে বাঁকানো। বিরিগণপতি নামেও তাঁর বন্দনা আছে। সেখানে তাঁর চেহারা সিঁদুরের মতো লাল, তিনটে চোখ, মাথায় অর্ধচন্দ্র, হাতে পাশ অঙ্কুশ পানপাত্র আর পদ্ম।

অন্য পুরাণেও গণেশের গায়ের রং একেবারে রক্তের মতো লাল, চেহারাও বিরাট। গায়ে নানা রকমের সব অলংকার, হাতে পাশ এবং অন্যান্য অনেক অস্ত্র যাতে শত্রুকে বিনাশ করতে পারেন। আর-একটি মন্ত্রে দেখি গণেশের বিরাট শুঁড়ে ধরা রয়েছে একটা ডালিম ফল, হাতে দণ্ড পাশ আর অঙ্কুশ তো আছেই, সেই সঙ্গে একটি হাতে আছে বরাভয় দানের ভঙ্গি।

গণেশের মহাগণমূর্তি একটু অন্যরকম। হাতির মতো মুখ, দেহ রক্তবর্ণ, তিনটে চোখ, কিন্তু দশটা হাত। সেই দশ হাতে আছে গদা, ধনুক, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, ডালিম ফল, ধানের গুচ্ছ, ধনরত্নের একটি কলসি এবং নিজেরই একটি দাঁত। মাথায় তাঁর মুকুট, গায়ে নানা রকমের গয়নাগাঁটি।

এখানে আর-একটা নতুন ব্যাপার আছে— হাতে একটি পদ্মফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশের বউ, তাঁর মাথাও হাতির মতো। এরকম একটি মূর্তি আছে দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই-এ, কিন্তু গণেশের বউয়ের সেখানে হাতির মাথা নয়, তিনি দেখতে পুরোটাই মানুষের মতো।

গণেশের আলাদা রূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র হল তাঁর হেরম্ব মূর্তি। এই রূপে গণেশ ঠাকুরের পাঁচটা মাথা, পাঁচটাই হাতির মাথা অবশ্য। কিন্তু মাথাগুলোর রং সব আলাদা—কোনো মুখ মুক্তোর মতো ঝক ঝক করছে, কোনো মুখের রং কাঁচা সোনার মতো, কোনো মুখ নীলবর্ণ, কোনো মুখ একেবারে শ্বেতপুষ্পের মতো সাদা, কোনো মুখ আবার কুমকুমের

মতো লাল। একটাই শুধু মিল, প্রত্যেক মাথাতেই তিনটে করে চোখ। গণেশের এই রূপে হাত তাঁর অনেকগুলি, হাতে আছে নানান অস্ত্র আর নানান ভঙ্গি। সেখানে যেমন আছে পানপাত্র আর বরাভয় মুদ্রা, তেমনি আছে মুণ্ডমালা, টাঙ্গি, মুগুর, অঙ্কুশ, ত্রিশূল আর নিজেরই দাঁত। তিনি বসে আছেন মহা আড়ম্বরে সিংহের ওপর। এইরকম পাঁচ-মাথাওয়ালা একটি গণেশমূর্তি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। এটি পাওয়া গিয়েছিল ওড়িশার ভুবনেশ্বরে।

গণেশ ঠাকুরের আর-এক চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায় পুরাণে, তাঁর নাম হরিদ্রা-গণেশ। এই ঠাকুরের গায়ের রং একেবারে হলুদ। তিনি যে পোশাক পরে থাকেন সেও হলুদ রঙের। তাঁর হাত চারটে— এক হাতে পাশ, অন্যহাতে অঙ্কুশ, এক হাতে পানপাত্র, আর-একটি হাতে নিজেরই দাঁত।

সিদ্ধিদাতা গণেশের হাতও চারটে, তবে এখানে তাঁর ডানদিকের ওপরের হাতে থাকে দণ্ড, নীচের হাতে পদ্ম; বাঁ-দিকের ওপরের হাতে লাড্ডু, নীচের হাতে কুড়ুল। মাথাটা হাতির মাথাই, তিনটে চোখ, বিশাল ভুঁড়ি, দাঁত একটাই, গায়ে পৈতের মতো করে জড়ানো আছে সাপ।

প্রায় একই রকমের আর-একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে তাঁকে বলা হয়েছে প্রসন্ন-গণেশ। মুখেচোখে একেবারে আহ্লাদ মাখানো। গায়ের রংটা হচ্ছে একেবারে দিনের প্রথম ওঠা সূর্যের আলোর মতো। গায়ে তাঁর লাল উত্তরীয় পরা, সেই সঙ্গে গায়ে গয়নাগাঁটিও প্রচুর। চারটে হাত, দু-হাতে পাশ আর অঙ্কুশ, অন্য দুটো হাতে বর আর অভয়।

আমাদের দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও পুজো করতেন গণেশ ঠাকুরের। তাঁদের তৈরি মূর্তি অবশ্য এমন ভয়ংকর রকমের যে দেখলে গা ছম ছম করে। সেখানে গণেশের একটাই মাথা, কিন্তু মাথায় লাল রঙের বিরাট জটা। সেখানেও অবশ্য মুকুট পরানো আছে। ঠাকুরের বিশাল ভুঁড়ি, তিনটে চোখ, দাঁত যদিও একটাই। সারা অঙ্গে প্রচুর অলংকার। এই ঠাকুরের বারোটা হাত। ডানদিনের হাতগুলোয় আছে কুঠার, বাণ, অঙ্কুশ, বজ্র আর শূল। বাঁ দিকের হাতগুলোয় আছে গদা, ধনুক, মুগুর, আর দুটি পানপাত্র— একটাতে আছে রক্ত, অন্যটায় আছে মাংস।

গণেশ ঠাকুর নাচছেন, এমন মূর্তিও বেশ কিছু পাওয়া গিয়েছে। এই সব মূর্তির রং হলুদ। বেশির ভাগ মূর্তিতেই তাঁর হাত আটটি, অবশ্য ছটা হাতওয়ালা মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। নাচের ভঙ্গি দেখাতে হবে বলে এরকম মূর্তির একটি হাত ফাঁকা থাকে, অন্য হাতগুলোতে থাকে নিজেরই দাঁত, ফুলের মালা, কুঠার, পানপাত্র এইসব। গায়ে পৈতের মতো সাপ জড়ানো থাকে এসব মূর্তিতেও। গণেশ ঠাকুর যে নাচছেন সেটা বোঝা যায় তাঁর ভঙ্গি দেখে— বাঁ পাটা একটু বেঁকানো, আর ডান পাটা বেঁকিয়ে মাটির ওপরে তোলা। সাজপোশাকও নাচের মতোই, পায়ে নূপুর, কোমরে মেখলা, হাতে বালা, ওপর হাতে কেয়ূর।

ভারতবর্ষের বাইরে চীনে যে মূর্তিটি বেশি পাওয়া যায় তার নাম ওখানে শো-তেন। চীনের গণেশ মূর্তিই বেশি পুরোনো। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটি গণেশমূর্তি চীনের মন্দিরে আছে। মূর্তিটিকে বলা হয় 'হাতিদের সম্রাট'। মন্দিরে অবশ্য আরও কিছু মূর্তি আছে। এখানকার মূর্তির দুটো হাত। ডানহাতে একটা পদ্ম, আর বাঁ-হাতে একটা ঝকঝকে মণি।

এখানেও মনে করা হয়, তিনি ধনসম্পদের দেবতা, তাঁর পুজো করলেই ঘর সোনাদানায় ভরে যাবে। জাপানের ই-কোমা পাহাড়ে হোজন-জি বলে একটা মন্দিরে গণেশের মূর্তি আছে— প্রচুর ব্যবসায়ী সেই ঠাকুরের পুজো করেন। জাপানে গণেশের মন্দির আছে প্রায় আড়াইশো, সেখানে আছে নানা রকমের সব মূর্তি।

এক মাথা এবং দু-হাতওয়ালা গণেশ ঠাকুর যেমন আছেন, তেমনি আছেন এক মাথা আর চার হাত কিংবা ছ-হাতওয়ালা

গণেশ ঠাকুর। একটাই হাতির মুণ্ডু, কিন্তু চারটে মুখ, এরকম মূর্তি আছে; আবার পুরোপুরি মানুষের মতো মূর্তি— দুই হাত-পাওয়ালা একেবারে মানুষের মুখ, শুধু মুকুটে একটা হাতির মুখ আঁকা, এরকম গণেশও আছেন। আর-এক রকমের গণেশ মূর্তি পাওয়া যায় জাপানে যেখানে দুটি হাতির মুখ জড়াজড়ি করে আছে। এইরকম জড়াজড়ি করে থাকা দুটি শূকরের মুখ, এরকম গণেশ মূর্তিও পাওয়া যায়। আবার, কেবল একটা শূকরের মুখ, এই মূর্তিও সেখানে পাওয়া গিয়েছে।

জাপানে যে মূর্তিটাকে খুব ভক্তি করে লোকে সেটা হল কঞ্জি-তেন মূর্তি। এখানে গণেশ ঠাকুর, আর একটি মেয়ে, দুজনেই একসঙ্গে আছেন। কেউ কেউ বলেন এটি গণেশ ঠাকুরের বউ, কেউ কেউ বলেন এটি তাঁর শক্তি।

গণেশ ঠাকুরের জন্ম

গণেশ ঠাকুরের জন্ম হল কেমন করে, এ নিয়ে পুরাণে নানান গল্প আছে। একটার সঙ্গে আর একটা গল্পের মিল নেই। তার ওপর আবার জাপানে গণেশ ঠাকুরের জন্ম নিয়ে একেবারে নতুন একটা গল্প। আবার বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের একটা ভাগ হল বিনয়পিটক, সেখানেও গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে আর একটা গল্প আছে। যে গল্পটা প্রচলিত সে গল্পটা বলবার আগে অন্য গল্পগুলোই বরং বলে নিই।

স্বর্গে দেবতাদের আর মর্তে মুনিঋষিদের বড়ো বিরক্ত করত অসুররা। অসুরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র মহাদেব, তিনিই তো ধ্বংসের দেবতা। মহাদেব দেখলেন পৃথিবীতে তাঁর মূর্তি আছে, জলে অগ্নিতে বাতাসেও আছে তাঁর মূর্তি, কিন্তু আকাশে তো কোনো মূর্তি নেই।

এরকম একটি মূর্তি থাকা দরকার, এই মনে করে পার্বতীর দিকে চেয়ে মহাদেব হাসতে লাগলেন, আর সেই হাসি থেকে তৈরি হয়ে গেল তাঁরই মতো মহাতেজস্বী এক সন্তান, গণেশ। কিন্তু কী রূপ এই কুমারের। দেখে দেবতারা তো মুগ্ধ বটেই, স্বয়ং পার্বতীও মুগ্ধ। এতটা আবার সহ্য হল না মহাদেবের, রেগে গিয়ে কুমারকে তিনি অভিসম্পাত দিলেন— তুই গজমুখ হ, লম্বোদর হ, সাপই হোক তোর উপবীত।

মহাদেবের কথা তো আর নিষ্ফল হবার নয়, সেইরকমই হয়ে গেলেন গণেশ। এই হল একটা পুরাণের গল্প।

আর একটি পুরাণের গল্পে আছে, পার্বতী খেলার ছলেই নিজের গায়ের ময়লা দিয়ে তৈরি করছিলেন একটা পুতুল। পুতুলটা দেখতে ভারি সুন্দর হল বটে, কিন্তু মাথা তৈরি করার মতো ময়লা আর ছিল না। তখন পার্বতী স্কন্দকে বললেন একটু ভালো কাদা নিয়ে আসতে।

তা ভালো কাদা আর স্কন্দ খুঁজে পেলেন না, শেষ পর্যন্ত একটা পাগলা হাতি দেখে তার মাথাটাই কেটে নিয়ে এলেন। পার্বতী বাধা দেবার আগেই সেই মাথা জুড়ে গেল গিয়ে পুতুলের ধড়ে। শিব তার প্রাণ দিয়ে তাকে করে দিলেন গণপতি।

অন্য এক গল্পে দেখি, পার্বতী শিবের সঙ্গে ঝগড়া করছেন তাঁদের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই বলে। শিব শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান, ছেলে মানুষ করবেন কখন! এ কথা শুনেই তো পার্বতী রেগে একেবারে আগুন। শিব করলেন কী, পার্বতীরই লাল কাপড় পুঁটলি পাকিয়ে এনে বললেন, এই নাও তোমার ছেলে। আশ্চর্য কাণ্ড, পার্বতী সেটা কোলে নিয়ে বসার পরই সেটি হয়ে গেল এক পুত্রসন্তান। শিব কিন্তু মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন, কারণ তিনি তো সবই জানেন— বুঝতে পারলেন এর আয়ু অত্যন্ত কম।

সত্যিই তাই হল, দেখতে দেখতে শিশুর মাথা খসে পড়ল ধড় থেকে। শিবের তো অনেক ক্ষমতা, তিনিও জুড়ে দিলেন শিশুর মাথা সঙ্গে সঙ্গে। তখন আকাশবাণী হল, উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়েছিল এই ছেলে, কাজেই এর মাথা বার বার খসে পড়বে, যতবারই তা লাগানো হোক। একমাত্র উপায়, উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়ে আছে, এমন কারও মাথা কেটে এনে ওখানে লাগিয়ে দেওয়া।

তাই হল। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে ওই অবস্থায় পাওয়া গেল। তারই মাথা কেটে এনে জুড়ে দেওয়া হল গণেশের মাথায়। ঐরাবতকে শিব সমুদ্রের জলে চুবিয়ে তার নতুন মাথা ফের তৈরি করে দিলেন।

গল্প আছে আরও অনেক। তার মধ্যে একটি গল্পে দেখি মহাদেব আর পার্বতী দুজনের মনেই দারুণ দুঃখ, একটা ছেলে নেই তাঁদের সংসারে! মহাদেব শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে বললেন, তুমি বিষ্ণুর আরাধনা শুরু করো, তাহলেই বিষ্ণুর মতো একটি পুত্র পাবে।

তাই করলেন পার্বতী। বিষ্ণুও ভারি সন্তুষ্ট পার্বতীর আরাধনায়। একদিন করলেন কী, এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অতিথি হয়ে এলেন পার্বতীর কাছে। অতিথিদের যত্নের কোনো ত্রুটি করেন না পার্বতী। এই অতিথিরও সেবা করলেন তিনি প্রাণপণে। খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথির একটু বিশ্রামের আয়োজন করতে গিয়েই তিনি অবাক, কোথায় গেলেন ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। আকাশবাণী শুনতে পেলেন পার্বতী—শোবার ঘরে গিয়ে দেখো তুমি কী পেয়েছ!

গেলেন পার্বতী শোবার ঘরে। দু-চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর। ফুটফুটে এক অপরূপ শিশু খেলা করছে বিছানায়। ডাকলেন মহাদেবকে। মহাদেবও আনন্দে আত্মহারা। সব দেবতা আর ঋষিদের নেমন্তন্ন করে এলেন তিনি শিশুকে আশীর্বাদ করার জন্যে। সূর্যের পুত্র শনিও এসেছেন নিমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু শিশুর ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই ছিন্ন হয়ে গেল শিশুর মাথা। সেই মাথা মিশে গেল বিষ্ণুর দেহের সঙ্গে।

শোকের ছায়া নেমে এল কৈলাসে। পার্বতী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্য বিষ্ণু একটি হাতির মুণ্ডু কেটে এনে জুড়ে দিলেন গণেশের দেহে।

এবার বলি জাপানের গল্প। গণেশের নাম সেখানে বিনায়ক, কিন্তু বিয়ায়কও আবার একজন নন। মহাদেবের মেয়ে কঙ্গি-তেন। দেবতা হিসাবে মহাদেব খুব সুবিধের নয় বলেই পাহাড়ে এসে বাসা বেঁধেছিলেন বিনায়ক। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বরটা ছিল ভারি কুচুটে আর ভীষণদর্শন। একটি পুরুষ-বিনায়ক এসে কঙ্গি-তেনকে বিয়ে করতে চাইল ফের, মেয়ে রাজিও হয়ে গেল। তারা দুজনে মিলেই হল জোড়া-বিনায়ক। এই জোড়া-বিনায়কই আমাদের গণেশ ঠাকুর।

প্রায় এই একই রকম আর-একটা গল্প আছে জাপানে। মহাদেব আর পার্বতীর তিন হাজার ছেলের মধ্যে দেড় হাজার ছিল ভারি বদমাইস, তাদের নেতা ছিল বিনায়ক। আর বাকি দেড় হাজার খুব ভালো, তাদের নেতা জিতেনতেন। বিনায়ককে সৎপথে আনার জন্যে জিতেনতেন মহাদেবের মেয়ে হয়ে জন্ম নিলেন, তারপর ভাইবোন হওয়া সত্ত্বেও এক সঙ্গে জোড়া-বিনায়ক হয়ে গেলেন।

বিনয়পিটকের গল্পটিরও বেশ মিল রয়েছে এই গল্পের সঙ্গে। এখানকার গল্প এইরকম যে, মহাদেবের তিন হাজার ছেলের মধ্যে এক হাজার খুব ভালো, বাকিরা ভীষণ দুর্দান্ত প্রকৃতির। এই কাজে ছেলেদের নেতা হল কঙ্গি, সে একটা পাকা শয়তান। কঙ্গির অত্যাচার থেকে রক্ষে পাবার জন্যে সবাই বোধিসত্ত্ব বা এগারো মুণ্ডুওয়ালা কন্নোনকে পুজো করতে শুরু করে। কন্নোন তখন খুব সুন্দরী এক নারীর রূপ ধরে বিনায়ককে নিয়ে এক সঙ্গে বাস করতে থাকেন, ফলে সে শান্ত হয়ে যায়।

এরকম জোড়া জোড়া মূর্তির কথা শুনে মনে হতে পারে একা গণেশ আবার দুজন হন কী করে। আসলে গণেশের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি গণেশের শক্তি হতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিত বলেন, এঁরা আসলে কার্তিক আর গণেশ। তবে দুষ্টুটাই কিন্তু গণেশ ঠাকুর।

সব শেষে সেই গল্পটা বলি, যেটা বেশি প্রচলিত এবং অনেক লোক জানে।

কৈলাস পর্বতে মহাদেবের বাড়ি। মহাদেবের বউ পার্বতীর একটা ব্যাপারে খুব অসুবিধে। মহাদেব তো শ্মাশান মশানে পড়ে থাকেন, সব ব্যাপারে অত হুঁশ থাকে না। পার্বতী হয়তো দুই সখী জয়া আর বিজয়াকে নিয়ে চান-টান করছেন, মহাদেব সঙ্গীদের

নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। পার্বতীরও খুব রাগ হয়, সখীরাও খুব রেগে যায়। তাই পার্বতী মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীকে বললেন, আমরা যখন চান করব, বাইরে তুমি পাহারা দেবে, কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না।

সেই নিয়মই হল, নন্দী রোজ ওই সময়টা এসে পাহারা দেয়। একদিন হয়েছে কী, পার্বতীর চানের সময় মহাদেব এসে হাজির। নন্দী পড়ল মহা ফাঁপরে। মহাদেব তো তার প্রভু, তার ওপর বাড়িটাও তাঁর। সেখানে নন্দী তাঁকে আটকায় কী করে। আটকালেও কি তিনি শুনবেন? প্রভুর মেজাজ তো ভালোই জানা আছে তার। মানে মানে সরে দাঁড়াল নন্দী।

পার্বতী তো ভীষণ রেগে গেলেন এতে। তিনি বললেন, এত বড়ো আস্পর্ধা নন্দীর! আমি বারণ করেছি তবু সে তোমাকে আটকাল না!

মহাদেব হেসেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা, পাত্তাই দিলেন না পার্বতীকে। এতে পার্বতীর মনে ভারি কষ্ট হল। তিনি করলেন কী, চান করার সময় গা থেকে যেসব ময়লা বার হয়, তাই দিয়ে বসলেন একটা মূর্তি গড়তে। মূর্তি যখন গড়া হল জয়া-বিজয়া তো অবাক। পার্বতী নিজেও চোখ ফেরাতে পারেন না এরকম অবস্থা।

পার্বতীর তো অনেক ক্ষমতা, তিনি সেই পুতুলের প্রাণ দিলেন, তাকে উপযুক্ত সব অলংকার দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শেষে তার হাতে এক মন্ত্রপূত দণ্ড দিয়ে বললেন, বাছা, তোমার ওপর একটি দায়িত্ব থাকল, দরজার বাইরে দাঁড়াও-- আমার অনুমতি না পেলে কাউকে ঢুকতে দেবে না বাড়িতে।

জন্মেই এরকম কঠিন পরীক্ষা! গণেশের তাতে কিছু আসে যায় না, বালকবীর দাঁড়িয়ে গেল দণ্ড হাতে। আর সেই দিনই মহাদেব এসে হাজির হলেন বাড়িতে। তিনি তো আর এত সব ব্যাপারের কিছুই জানেন না, তিনি বালককে ঠেলে সরিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলেন ভেতরে, বালক বলল, খবরদার! আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না এখানে।

মহাদেব সে কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বালক সেই দণ্ড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল তাঁকে। খেপে উঠলেন মহাদেব এবার— কী! আমি মহাদেব, পার্বতীর স্বামী, আমাকেই তুই ঢুকতে দিবি না বাড়িতে?

উত্তরে বালক আবার চালাল সেই দণ্ড। মহাদেব যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তাঁর যেসব সাঙ্গোপাঙ্গ, এক কথায় যাদের 'গণ' বলে, তাদের জানালেন সব কথা। তারা হইহই করে বেরিয়ে পড়ল কে এই বালক দেখবার জন্যে। এতটুকু ছেলে কিনা মহাদেবকে বাধা দেয়। তারা চিৎকার করে বলল, আমরা মহাদেবের গণ! যদি প্রাণের মায়া থাকে তো সরে পড়ো এখান থেকে।

বালক পড়ে গেল ধাঁধায়। এবার কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না, কিন্তু হট্টগোলের শব্দ তখন ভেতরেও পৌঁছেছে। পার্বতী ভীষণ রেগে গিয়ে জয়াকে দিয়ে বলে পাঠালেন, যেই হোক, ওকে বলো বাইরে আটকাতে। আমাদের চান না হলে কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না।

আদেশ পেয়ে বালকও রুখে দাঁড়াল, বলল, মায়ের আদেশ। দরজা থেকে আমি নড়ব না! মায়ের আদেশ! মহাদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে জানাল, প্রভু, ওতো আপনারই সন্তান। ওর সঙ্গে আমরা কেমন করে লড়াই করি!

লড়াই! একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে? —মহাদেব জ্বলে উঠলেন, বুঝতে পারছিলেন এ পার্বতীরই কোনো কারসাজি, বললেন, শেষ করে দাও ওকে, কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

কিন্তু কে কাকে শেষ করে। বালকের পরাক্রমে শিবের গণবাহিনীই পালাতে পথ পায় না। দেখে কিন্তু স্বর্গের দেবতাদেরও

তখন টনক নড়েছে। তাঁরা এসে মহাদেবকে জানিয়েছেন বালক আসলে তাঁরই ছেলে, এর ওপর আক্রমণ চালানো ঠিক নয়। কিন্তু মহাদেব তখন রাগে জ্বলছেন, বললেন, আপনারা গিয়ে বোঝান ওকে, নইলে আমার হাত থেকে ওর রক্ষে নেই।

ব্রহ্মা গেলেন বোঝাতে, কিন্তু দরজা ছেড়ে দাঁড়াবার কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর যে তিনি যে লড়াই করতে আসেননি, সে কথা বলারও ফুরসত পেলেন না।

এদিকে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে মহাদেবের রাগ গেল আরও চড়ে, তিনি দেবসেনাপতিকে বললেন, এখুনি আপনি যুদ্ধযাত্রা করুন, বালককে সমুচিত দণ্ড দিন। দেবসেনাপতি এসেছেন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামান্য একটি বালকের সঙ্গে লড়াই করতে, এ খবর পার্বতীর কাছে যখন পৌঁছোল, তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, দেখি আমার সন্তানকে আমি রক্ষা করতে পারি কি না পারি।

তিনি নিজের দুই শক্তি সৃষ্টি করলেন মুহূর্তে— একজন কালী, অন্যজন দুর্গা। মা কালী গিয়ে দাঁড়ালেন বালকের সামনে। যত অস্ত্র ছোঁড়া হল বালকের দিকে, সব তিনি বিরাট হাঁ করে গিলে ফেললেন। ওদিকে বাঘে চড়ে মা দুর্গা ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেবসৈন্যের ওপর। মুহূর্তে রণে ভঙ্গ দিয়ে দেবসেনাপতি কৈলাস ছেড়ে পালালেন। তাঁদের দেখে মহাদেব উঠে পড়লেন নিজের আসন থেকে। পার্বতী কীভাবে দেবসৈন্যকে বাধা দিয়েছে শুনে নিয়ে বললেন, এতদূর স্পর্ধা। ঠিক আছে, বাচ্চাটার ব্যবস্থা আমিই করছি।

বললেন বটে, কিন্তু দেখা গেল সমস্ত দেবতা একসঙ্গেও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। বেগতিক দেখে মহাদেব এবং বিষ্ণু মন্ত্রণা করলেন কোনো কৌশলে এই বালককে মারতে হবে, সামনাসামনি যুদ্ধ করে একে কিছু করা যাবে না।

মহাদেব নিজে প্রথমে এগিয়ে এলেন ত্রিশূল নিয়ে। কিন্তু ত্রিশূল তোলার আগেই বালকের দণ্ড লেগে তা ছিটকে পড়ল। মহাদেব ধনুক তুলে নিলেন হাতে, বালক দণ্ডের আঘাতে তা ভেঙে দিল।

ওদিকে বিষ্ণু এগিয়ে এলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে। বালক যখন সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করছে, পেছন থেকে মহাদেব শূল নিক্ষেপ করলেন, বালকের মাথা লুটিয়ে পড়ল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

পার্বতীর চোখ থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল, বললেন, অন্যায় যুদ্ধে মারা হয়েছে আমার পুত্রকে। আমি অভিশাপ দেব দেবতার বংশ যাতে ধ্বংস হয়ে যায়।

পুত্রশোকে পার্বতী যে অভিশাপ দেবেন তা ফলবেই ফলবে। অগত্যা মহাদেব পার্বতীর কাছে এসে করুণভাবে বললেন, দেবী, তুমি অভিশাপ দিয়ো না, তোমার পুত্র আমাদের সকলের গর্ব। তাকে আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। উত্তর দিকে যাকেই প্রথম দেখতে পাব, তার মাথা জুড়ে দেব আমাদের পুত্রের দেহে।

একটি এক দাঁতওয়ালা হাতিকেই সেখানে প্রথম পাওয়া গেল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে তার মুণ্ডু কেটে এনে জুড়ে দিলেন বালকের দেহে। সব দেবতা আশীর্বাদ করে বললেন, বালকের বীরত্বে আমরা অভিভূত। সব দেবতার আগে ইনি পুজো পাবেন, আর গণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে এঁর নাম হবে গণেশ।

এই তো গেল গণেশ ঠাকুরের জন্ম নিয়ে হরেক গল্প। তাঁর চেহারাটা তো ঠিক অন্য সব দেবতার মতো নয়, একটু আলাদা রকমের। কেন এরকম আলাদা হল, সেগুলো জানতে পারলে গণেশ ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক—অনেক কথা জানতে পারব।

গণেশের কেন হাতির মুণ্ডু

অবাক হবার মতোই কাণ্ড বটে, এত দেবতা আছেন, কারও শরীরে পশুর মাথা বসাবার দরকার হল না, স্বয়ং যিনি সিদ্ধিদাতা তাঁর মাথাটাই কিনা পশুর তাও আবার যে-সে পশু নয়, একেবারে হাতি। সে হাতি যদি হয় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

পার্বতীর শাপের ভয়ে মহাদেব বলেছিলেন, উত্তরদিকে যাকেই দেখতে পাও মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে এসো, আর ছাগলমুখো নন্দী— তার আর বুদ্ধি কত, হাতি তো হাতিই সই, সেই মুণ্ডুই নিয়ে চলে এসেছে, এমনটা হতেই পারে।

আর একটা গল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই গণেশের জন্যে ঐরাবতের মুণ্ডু কেটে এনেছেন, সেখানে তো একথা বলা যাবে না। সে গল্পে শনি ঠাকুরকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। তিনি তো জানেনই তাঁর দৃষ্টিটা সর্বনেশে, তাই গণেশের দিকে মোটেই তাকাননি তিনি। শেষে পার্বতী যখন বার বার অনুরোধ করছেন তখন আর না তাকিয়ে উপায় কী!

অথচ তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। অবশ্য ঐরাবতের মাথা বিষ্ণু কেন কাটলেন, তারও একটা কারণ আছে। তাঁর দেওয়া পারিজাত ফুল একবার দুর্বাসা মুনি উপহার দিতে গিয়েছিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র সে উপহার নিজে না নিয়ে রেখেছিলেন ঐরাবতের মাথায়। তখনই দুর্বাসা অভিশাপ দিয়েছিলেন ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা কাটা যাবে। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হল—গণেশের প্রাণও বাঁচল, ঐরাবতের মাথাও কাটা পড়ল।

এ তো হল গল্প। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত মানুষ তাঁরা বলেন, এরকমটা হল কেন, সেটাও তো ভাবতে হবে। শিবের ত্রিশূলেই কাটা পড়ুক আর শনিঠাকুরের দৃষ্টিতেই খসে যাক, গণেশের মুণ্ডু একটা দরকার, এই হচ্ছে আসল কথা।

এবার সেখানে সুন্দর দেখতে একটা মানুষের মাথা কেটে এনে বসিয়ে দিলেই তো হত—উত্তরদিকে মুখ করে ঘুমোনো একটা মানুষও কি আর খুঁজে পাওয়া যেত না। তাহলে তো ওই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হত না, মানে দেবতার শরীরে হাতির মাথা! কাজেই এর কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে!

কারণটা কী হতে পারে, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলছেন, গণেশ ঠাকুরের যে প্রচণ্ড ক্ষমতা, সেটা বোঝাবার জন্যেই সাধারণ মুণ্ডু না দিয়ে হাতির মুণ্ডু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর দেহে। হাতির মতো বিরাট শক্তিধর প্রাণী পৃথিবীতে তো আর নেই। ঋগ্বেদে তাকে ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঝড় যেমন বিরাট গাছপালা সব উপড়ে ফেলে দেয়, হাতিও সেরকম বড়ো বড়ো গাছপালা ভেঙে ফেলতে পারে।

খুব শক্তিমান বোঝাবার জন্যে তাই গ্রিক রাজারা পয়সায় হাতির ছবি খুদে দিতেন। আমাদের দেশের অনেক পুরোনো জাতিও হাতির ছাপওয়ালা মুদ্রা ব্যবহার করত। হাতির জোরই যে গণেশের ছিল এটা বোঝাবার জন্যেই নাকি তাঁর হাতির মুণ্ডুর কথা ভাবা হয়েছিল।

আবার একদল পণ্ডিত বললেন, না না, এটা ঠিক নয়। গণেশ ঠাকুর ঠিক কোন দেবতার অংশ সেটা বোঝাবার জন্যেই এই বন্দোবস্ত। শিবের অংশ থেকেই যে গণেশের জন্ম, সে তো সব পুরাণই বলে—সে শিবের হাসি থেকেই হোক, আর পার্বতীর গায়ের ময়লা থেকেই হোক।

শিবের আর এক নাম রুদ্র। তিনি আবার অনেক রুদ্র বা বিনায়ক তৈরি করেছেন। গণেশেরও আর এক নাম বিনায়ক। গণেশ ঠাকুরের আরও অনেক মিল আছে শিবের সঙ্গে— গণেশের ভুঁড়িটাও শিবেরই মতন। শিবের গায়ে সাপ জড়িয়ে থাকে, গণেশের পৈতেও হল ওই সাপ।

গণেশ কি শুধু শিবেরই অংশ! শিবকে তপস্যা করে তাঁর মতো স্বামী পেয়েছেন পার্বতী, কিন্তু নারায়ণকে তপস্যা করে তাঁর বরেই ছেলে পেয়েছেন তিনি। কাজেই গণেশের মধ্যে তো এই দুই দেবতারই অংশ থাকা উচিত।

বিষ্ণুর দেওয়া পারিজাত মাথায় রেখেছিল ঐরাবত, সেই ঐরাবতের মাথা যদি গণেশের মাথা হয়, তবে বিষ্ণুর আশীর্বাদ তো সেখানে থাকলই। আবার ঐরাবত মানেই দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁর পতাকাতেও হাতির ছবিই আঁকা থাকে। গণেশের মাথা হস্তীমুণ্ড করে দিয়ে, তাঁর হাতে অঙ্কুশ দিয়ে তাঁকে ইন্দ্রের অংশও করা হল খানিকটা।

গণেশ ঠাকুর বড়ো সহজ ঠাকুর নন। মহাদেব, নারায়ণ আর দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি মিলিয়ে তাঁকে তৈরি করা হয়েছে। ওই জন্যেই তো সবার আগে গণেশ পুজো। ওই জন্যেই তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ।

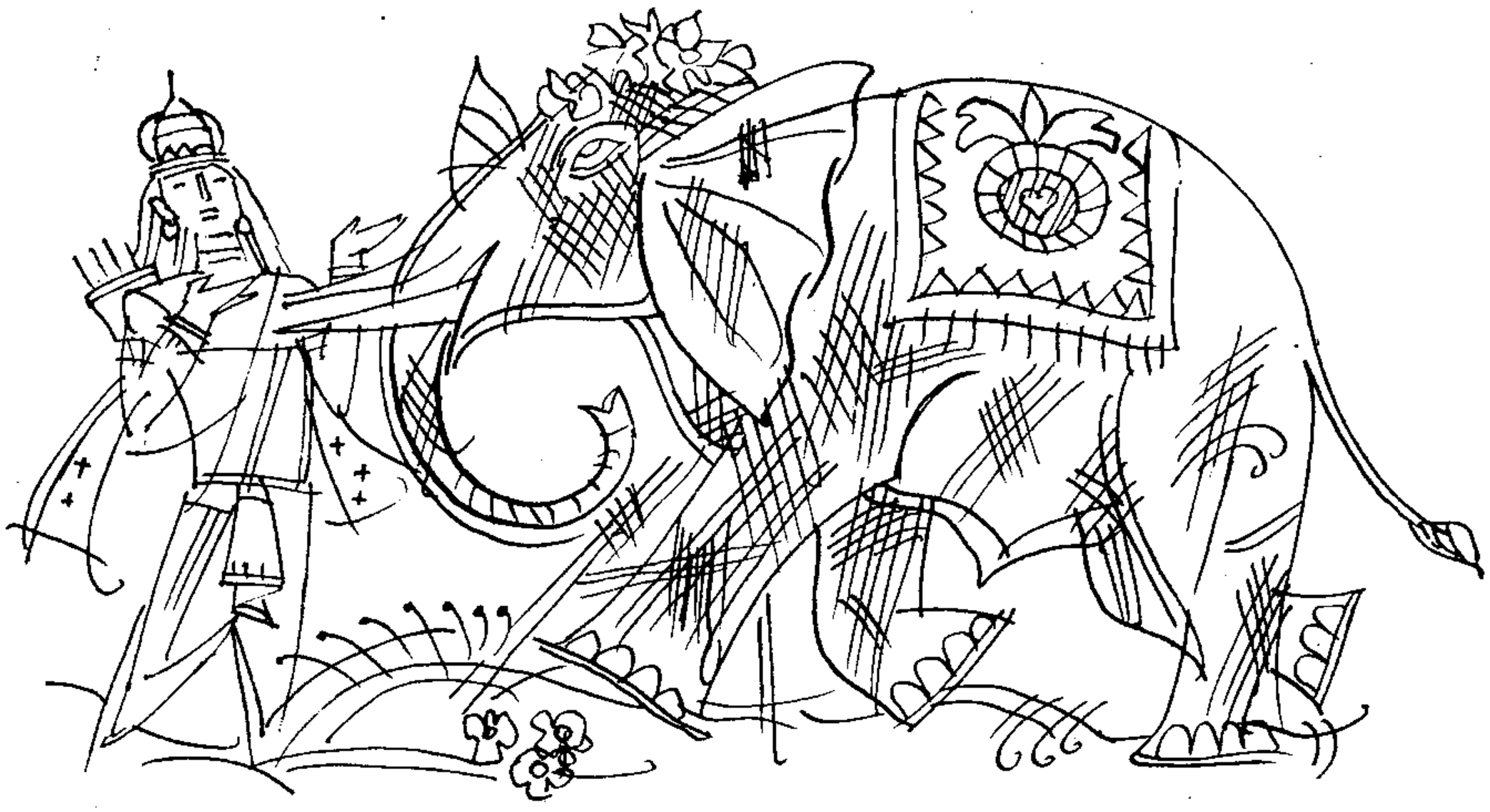

গণেশ কেন একদন্ত

হাতির মুণ্ডু না হয় গণেশ পেলেন এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না বলে, কিন্তু হাতির তো দুটো দাঁত থাকে, গণেশের একটা কেন! দু-একটা মূর্তিতে নয়, গণেশের প্রায় সব মূর্তিতেই দেখা যাচ্ছে তাঁর একটি দাঁত। কোথাও কোথাও আবার এরকমও দেখা গিয়েছে, একটা দাঁত অস্ত্রের মতো করে হাতে নিয়ে রয়েছেন গণেশ ঠাকুর।

এ নিয়ে কয়েকটা গল্প আছে। কৈলাসে একদিন মহাদেব আর পার্বতী ভেতরের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। পাছে এই সময় কেউ তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, সেই জন্যে গণেশ দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পাহারায়। গণেশকে এড়িয়ে ভেতরে যাবার উপায় নেই কারও।

এখন হয়েছে কী, ওইদিনই পরশুরাম এসেছেন হরগৌরী দর্শন করতে। পরশুরাম মহাবীর, ঋষি হিসেবেও তিনি অনেক বড়ো। তিনি তো আসলে বিষ্ণুরই অবতার। কিন্তু মেজাজটি তাঁর বড়োই চড়া। অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। রেগে গেলে আর কোনো জ্ঞানগম্যি থাকে না তাঁর। এবারেও সেই কাণ্ডই হল।

মহাদেব আর পার্বতীকে দেখতে এসেছেন তাঁদের ভক্ত বলেই, কিন্তু গণেশ সে কথা বুঝবেন কেন! মহাদেব তাঁকে পাহারা দিতে বলেছেন বাইরে। পরশুরাম যখন ভেতরে যেতে চাইলেন, তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, ভেতরে যাবার হুকুম নেই।

হুকুম নেই! পরশুরাম এসেছেন দেখা করতে, ভেতরে যাবার নাকি হুকুম নেই! মেজাজ চড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, বললেন, কে হে তুমি ছোকরা, আমাকে আটকাও!

আমি যেই হই, তোমাকে আমি ভেতরে যেতে দেব না— সাফ জানিয়ে দিলেন গণেশ।

বটে! আমাকে আটকাবে তুমি! আমার পরিচয় জানো?

জানার দরকার নেই আমার। আমি এখানে পাহারায় আছি, আমার ওপর কড়া হুকুম, কাউকে ভেতরে যেতে আমি দিতে পারব না।

সরে যাও আমার সামনে থেকে— ঠেলে গণেশ ঠাকুরকে সরিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন পরশুরাম।

গণেশ নিজের গদা মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, গায়ের জোরে ঢুকবে নাকি ভেতরে? সেসব মতলব ছাড়ো ঠাকুর। তোমার ওই কুঠার নিয়ে চটপট সরে পড়ো এখান থেকে।

তবে রে অর্বাচীন বালক! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা— কুঠার ঘাড়ের ওপর তুলে বললেন পরশুরাম, সারা পৃথিবী ভয় পায় এই কুঠারকে, আর তুই এসেছিস আমাকে বাধা দিতে!

সারা পৃথিবী ভয় পেতে পারে, আমি ওতে ভয় পাই না।

তাই নাকি! দেখ তাহলে এই কুঠারের শক্তি কত।

ব্যাস, লেগে গেল যুদ্ধ। একদিকে পরশুরামের মতো বীর, একুশবার পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কে যিনি মেরে শেষ করেছেন। অন্যদিকে বালক হলেও গণেশের মতো দেবতা, শক্তি আর সাহসে যাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার।

শক্তিতে কেউই বড়ো কম যান না। তুমুল যুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু মহাদেবের নিদ্রা কি আর চট করে ভাঙে! যুদ্ধ

চলতে চলতেই হঠাৎ পরশুরামের কুঠার এসে পড়ল গণেশের একটি দাঁতে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতটি ভেঙে গেল তাঁর। রক্তের ধারায় সর্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠল গণেশ ঠাকুরের। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। তাই বলে রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র তিনি নন। সেই অবস্থাতেই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আক্রমণ করলেন পরশুরামকে।

এইভাবে আক্রমণ-পালটা আক্রমণ চলছে, হঠাৎই একসময় ঘুম ভেঙে গেল হর-পার্বতীর। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল ভয়ানক কাণ্ড। একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত পরশুরাম— এতক্ষণ লড়াই করে শ্রান্ত ক্লান্ত বিধ্বস্ত; অন্যদিকে বালক গণেশ রক্তাক্ত মুখে, রক্তাক্ত দেহে লড়াই করে যাচ্ছেন।

থামো, থামো— মহাদেব হাত তুলে থামালেন দুজনকে। পরশুরামকে বললেন, এ তুমি কী করছ! আমার বালক পুত্রের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করছ? তারপর গণেশের দিকে ফিরে বললেন, ঋষি পরশুরামের প্রতি এ তোমার কীরকম আচরণ!

এটাই সঠিক আচরণ— রাগে জ্বলে উঠলেন পার্বতী, বললেন, তুমি যে কাজের দায়িত্ব ওকে দিয়েছ, পুত্র সেটাই পালন করছিল। উনি জোর করে কেন ঢুকতে গেলেন ভেতরে? ছেলের কী দশা উনি করেছেন সেটা কি তুমি দেখেছ? আমি ওঁকে ক্ষমা করতে পারব না।

দেখতে দেখতে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করলেন পার্বতী, হাতে তাঁর শাণিত তলোয়ার। এই নিয়ে যদি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কারও ওপর— দেব, দানব, মানুষ কারোরই রক্ষা নেই তাহলে। মহাদেব দেখলেন সমূহ বিপদ। ধ্যানে তিনি বিষ্ণুকে জানালেন সব কথা। বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সামনে এসে বললেন, মাগো, বাড়িতে অতিথি এসেছে তোমার।

অতিথি দেখলে পার্বতী গলে যান। মুহূর্তে রাগ পড়ে গেল তাঁর। বেঁচে গেলেন সে যাত্রা পরশুরাম।

এ তো গেল অবশ্য গল্পের দিক, গণেশ ঠাকুর যে একদন্ত, তার অন্য মানেও করা যায়। দন্ত কথাটার আর-একটা মানে হল দমন। শত্রুকে দমন করাও গণেশ ঠাকুরের একটা প্রধান কাজ। তাঁর হাতে যে অস্ত্র হিসেবে একটা দাঁত ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা বোধ হয় ওই দুটো মানের যোগফল।

গণেশের ধ্যানেও বলা হয়েছে, তিনি দন্তের আঘাতে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করেন, আর তাদের রক্তেই তাঁর দেহ লালরক্তের হয়ে উঠেছে। কাজেই ওই একদন্তরূপ বা হাতে অস্ত্র হিসেবে একটি দাঁত তাঁর বীরত্বই প্রকাশ করে।

গণেশের গায়ে সাপ কেন

গণেশ ঠাকুরের গায়ে সাপ যেমন করে লেপটে থাকে, তাকে সাপ না বলে পৈতে বলাই ভালো। সাপ তো মহাদেবের সম্পত্তি। তিনি গায়ে সাপ জড়িয়ে রাখেন, মাথার জটায় তাঁর সাপ ঘোরাফেরা করে, এমনকী পোশাক বলতে যে বাঘছাল, সেই বাঘছালকে তাঁর কোমরে জড়িয়েও রাখে সাপ। কিন্তু গণেশের গায়ে সাপ থাকবে কেন!

গণেশ শিবের সন্তান, সেটা বোঝাবার জন্যে একটা চিহ্ন কিছু রাখতে হবে। গণেশ তো আর শ্মশানে ভূতপ্রেত নিয়ে ঘুরে বেড়ান না, কাজেই সাপ তাঁর দেহে আসবে কোথা থেকে! সেই জন্যেই গণেশ ঠাকুরের পৈতেটাকেই সাপ করে দেওয়া হল। এখন বিভিন্ন মন্দিরে গণেশের যে মূর্তি আছে, সেই সব মূর্তির গলায় এরকম রুপোর তৈরি সাপ বা পৈতেই দেখতে পাওয়া যায়।

আবার নারায়ণের সঙ্গেও সাপের একটা বহুদিনের সম্পর্ক আছে। সৃষ্টির আদ্যিকালে যখন চারিদিকে শুধু জল আর জল—প্রলয়বারিতে সব একেবারে থই থই করছে, কোথাও এক বিন্দু মাটি দেখা যায় না, তখন সেই অগাধ জলের ওপর নারায়ণ আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি সাপেরই ওপরে। তার নাম হচ্ছে অনন্ত নাগ।

সেই অনন্ত নাগের ওপর অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন নারায়ণ। সেই অবস্থাতেই তাঁর নাভিকুণ্ডলী থেকে জন্ম হয় প্রজাপতি ব্রহ্মার যিনি পরে মানুষ আর অন্যান্য জীব সৃষ্টি করবেন।

নারায়ণকে এইরকম অসীম সমুদ্রে যে নাগ আশ্রয় দিয়েছিল সেই নাগের সঙ্গে নারায়ণের সম্পর্ক তো খুব কাছাকাছি হবেই।

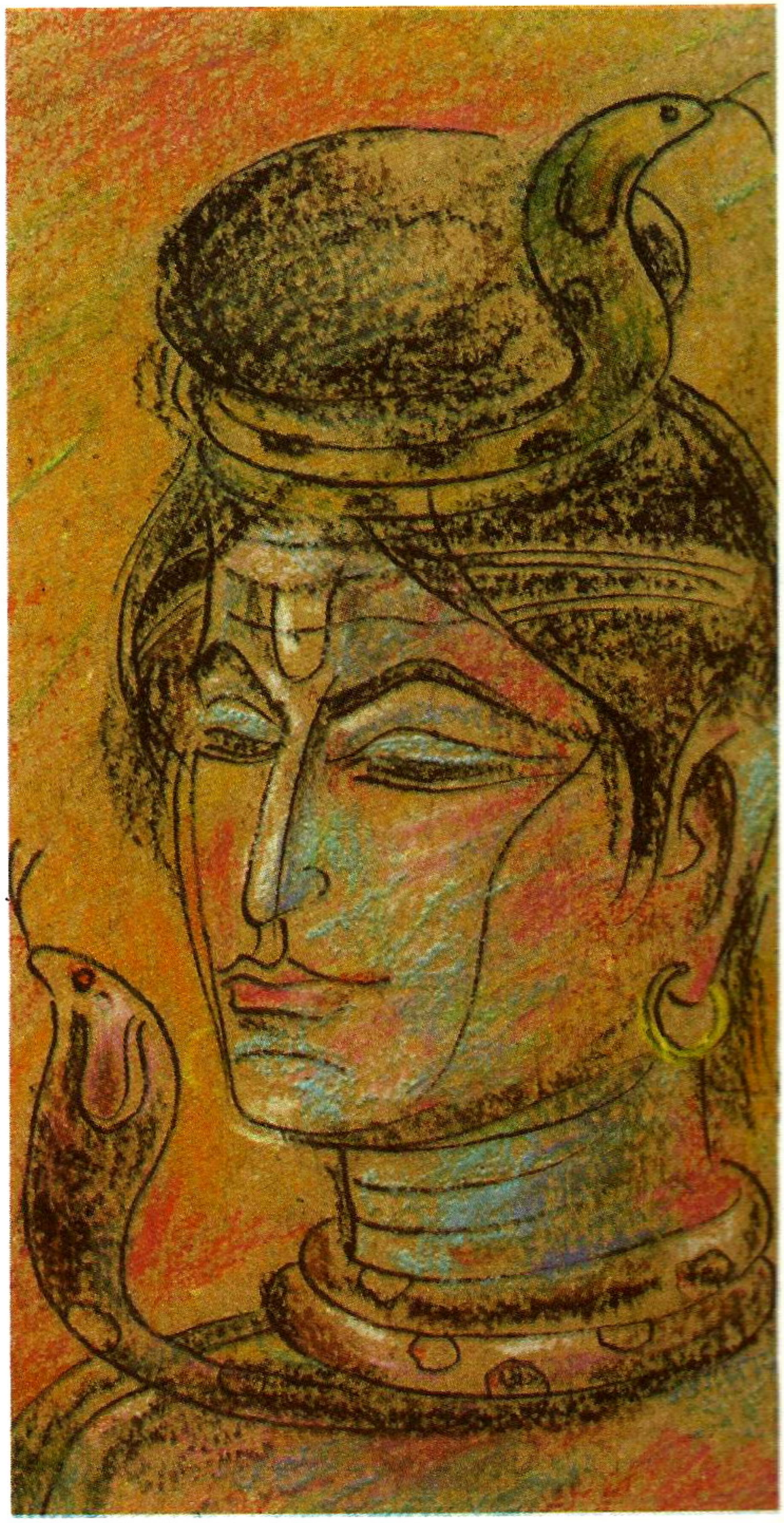

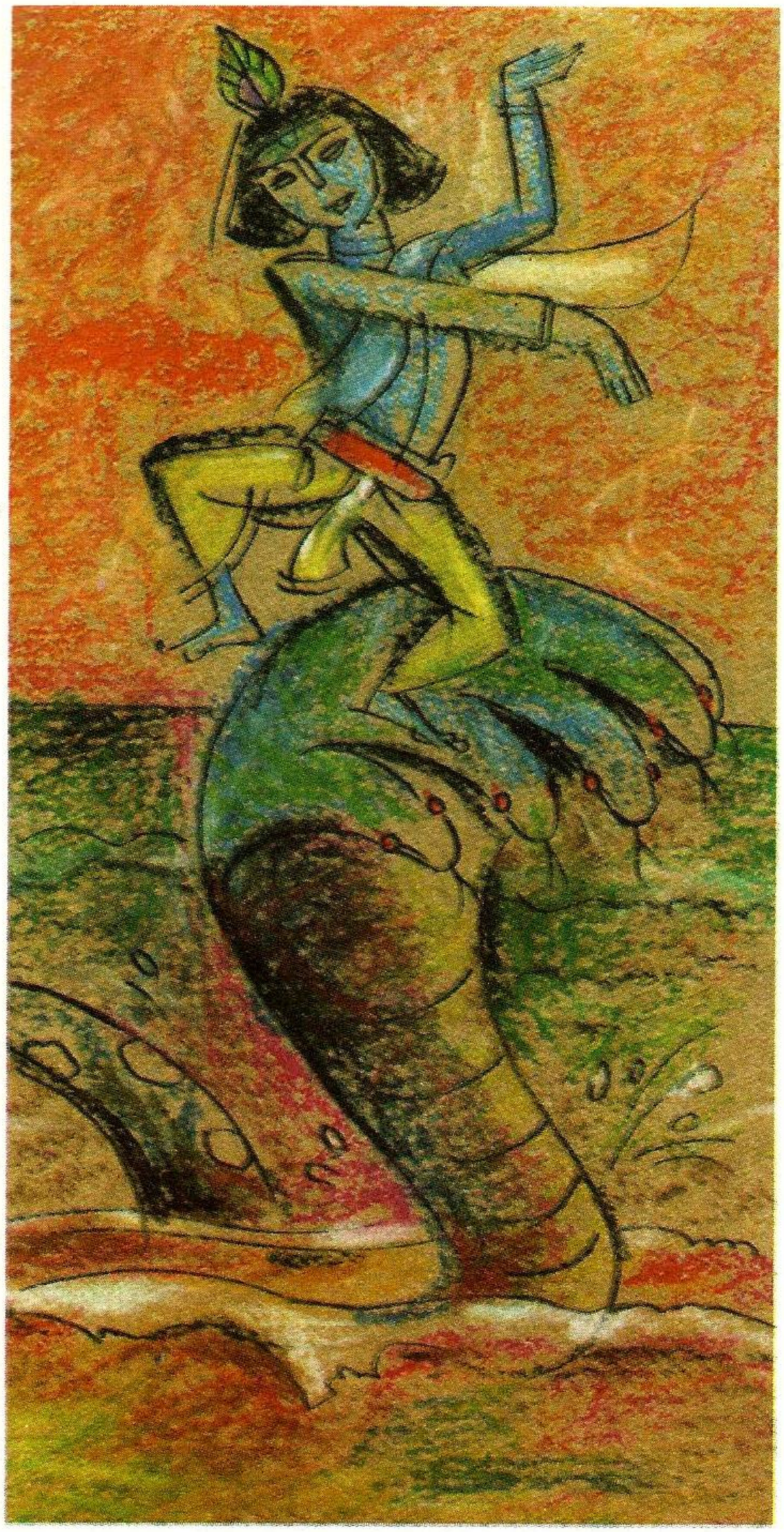

শত্রুর মতো সম্পর্কও একটা আছে। নারায়ণ আর কৃষ্ণ তো আলাদা দেবতা নন, তিনি কৃষ্ণরূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কালীয়দমন করেছিলেন।

কালীয় বিষধর সাপেদের রাজা। সমুদ্রেই তার বাস, কিন্তু গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে সমুদ্র ছেড়ে সে আশ্রয় নেয় কালীয় হ্রদে। মুখ দিয়ে তার আগুন আর ধোঁয়া বেরোয়। হ্রদের জল বিষাক্ত হয়ে যায় তার বিষে। রাখালরা গোরু চরাতে এসে সেই জল খেয়ে মারা যেত, গোরুগুলোও বাঁচত না।

এদের বাঁচাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। কালীয় নাগ সহস্র ফণা বিস্তার করে ধেয়ে আসে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ফণার ওপর উঠে নাচতে শুরু করেন। এইভাবেই কালীয় নাগ তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। কৃষ্ণের আশ্বাস পেয়ে কালীয় চলে যায় ফের সমুদ্রে।

কাজেই, এই ঘটনা থেকেও বলা যায়, সাপের সঙ্গে নারায়ণের একটা সম্পর্ক আছে। আবার, যে বৃত্রাসুরকে দেবরাজ ইন্দ্র বধ করেছিলেন, সেই বৃত্রও অহি নামে পরিচিত ছিলেন। অহি মানেই সাপ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইন্দ্রের সঙ্গেও সাপের একটা সম্পর্ক আছে। সেরকম সম্পর্ক অবশ্য সূর্য দেবতার সঙ্গেও সাপের আছে, কারণ সূর্যের গমনপথটাকেই বলে নাগ বা সাপ।

তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, সাপের একটা চিহ্ন গণেশের দেহে রেখে দেবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বর্গের প্রধান সব দেবতা— শিব, নারায়ণ, ইন্দ্র, সূর্য, প্রত্যেকের সঙ্গে গণেশ ঠাকুরের যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। গণেশ ঠাকুর যে এইসব দেবতার শক্তির অংশ নিয়ে জন্মেছেন, সেটা আমরা বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে পার্বতীর অসীম শক্তি তো তাঁর মধ্যে আছেই। কী বিরাট ক্ষমতা এই ঠাকুরটির।

গণেশ ঠাকুর পরম জ্ঞানী

বেদে বলা হয়েছে, গণেশ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের মধ্যেও তাই। সেখানে স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে বলেছেন, জ্ঞানীদের শিরোমণি। পুরাণে তাঁর একটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে তাঁর হাতে রয়েছে বই, কলম আর জপমালা। বই তাঁকে কে দিয়েছেন সে কথা অবশ্য বলা নেই, কিন্তু কলম দিয়েছেন স্বয়ং বিদ্যার দেবী সরস্বতী, আর জপমালা দিয়েছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা।

আর একটি পুরাণে বলা হয়েছে গণেশের পাঁচটি মুখ, আর সেই পাঁচ মুখে বেদের আগম তত্ত্বের মতো কঠিন জিনিস তিনি ব্যাখ্যা করে শোনান সব দেবতাকে। পণ্ডিত আর জ্ঞানী তো বটেই, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখবার ক্ষমতাও ছিল গণেশ ঠাকুরের। স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাঁকে কলম দিয়েছেন।

তার প্রমাণ আমাদের মহাকাব্য 'মহাভারত'। মহাভারতের কবি ছিলেন বেদব্যাস। বিরাট এই মহাকাব্য লিখবার সংকল্প তো ব্যাসদেব করলেন মনে মনে, কিন্তু যে সব শ্লোক মাথায় আসবে সেগুলো চটপট লিখে ফেলবার জন্যে খুব লিপিকুশল একজন জ্ঞানী মানুষ চাই তো। নইলে লিখতে লিখতেই তো মনের ভাব হারিয়ে যাবে। সেরকম যোগ্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে ব্যাসদেব শরণাপন্ন হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার। ব্রহ্মাই বলে দিলেন— গণেশ ঠাকুরের মতো পণ্ডিত আর লিপিকুশল দেবতার কাছে যেতে।

গণেশকে ব্যাসদেব এসে অনুরোধ করতে তিনি তো এক কথায় রাজি। কিন্তু তাঁর একটাই শর্ত, লিখতে আরম্ভ করলে কিন্তু তিনি থামতে পারবেন না— গল্প বলেই যেতে হবে অনর্গল।

ব্যাসদেবও তো আর কম বুদ্ধিমান নন, তিনি বললেন, আমারও কিন্তু একটা শর্ত আছে। প্রত্যেকটা শ্লোকের অর্থ একেবারে ঠিকঠাক বুঝতে পারলে তবেই লেখা যাবে। বুঝতে না পারলে চিন্তা করে সেটার মানে আগে নিজের মনে ঠিক করে নিতে হবে।

তাতেই রাজি গণেশ ঠাকুর।

শুরু হয়ে গেল লেখা। মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই খস খস করে দাগ কেটে যাচ্ছে গণেশের কলম। মাঝে মাঝে এমন হয় যে ব্যাসদেবই অস্থির হয়ে পড়েন—এ তো শুধু মুখে মুখে বলা নয়, মনে মনে রচনা করা। এরকম সৃষ্টির কাজ কি অনর্গল চলতে পারে। একটু তো চিন্তা করতেই হয়, কিন্তু গণেশ তো তা শুনবেন না!

একটা উপায় বেদব্যাস নিজেই বার করলেন। গণেশ ঠাকুরের কলমকে থামিয়ে দেবার জন্যে বলছেন একটা করে উদ্ভট শ্লোক। এমন শ্লোক যে, গণেশ ঠাকুরের মতো জ্ঞানী দেবতাকেও কলম থামিয়ে খানিক ভাবতে হচ্ছে। মহাভারতের এইসব জায়গাগুলোকে বলে ব্যাসকূট।

সে যাই হোক, আঠারো পর্বের মহাভারত একসময় শেষ হল। গণেশ ঠাকুর এ কাজের ভার না নিলে মহাভারত শেষ করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

গণেশ ঠাকুর চোর না কি?

গণেশের মতো দেবতা, দুর্গার মতো দেবী যাঁকে সযত্নে তৈরি করেছেন, মহাদেবের মতো বাবা যাঁকে এত ভালোবাসেন, তিনি হঠাৎ চুরি করতে যাবেন কেন!

প্রশ্নটা কেন উঠল সেটা আগে বলি। গণেশ ঠাকুরের অনেক ধ্যান আছে, তার মধ্যে একটা ধ্যানের নাম হচ্ছে চৌর গণেশ। বলা হয়েছে, চোররা চুরি করতে যাবার আগে যেন দশবার এই মন্ত্রটা জপে নেয়। মন্ত্রের মানে হচ্ছে— হে চোরদের অধীশ্বর, সমস্ত জপতপ পুজোয় তোমার তেজই লুকিয়ে আছে; তাই কাজে সফল হবার জন্যে চোরদের এই চৌরমন্ত্রই ভালো করে জপ করে নিতে হবে। তার মানে চোর-জোচ্চোরদের দেবতা হচ্ছেন গণেশ ঠাকুর। তাঁর নাম নিলে চোরকে ধরে কার সাধ্যি!

কী করে এরকম একটা কথা রটে গেল! গণেশ ঠাকুর নিজে চুরি করেছেন সেরকম কোনো ঘটনার কথা শোনা যায় কি!

একটা ঘটনার কথা কেউ কেউ লিখেছেন। গণেশ ঠাকুর নাকি ছোটোবেলায় একবার কী একটা চুরি করেছিলেন, আর সেই জন্যে পার্বতীর কাছে বিরাট ধমক খেয়েছিলেন। কিন্তু ছোটোবেলায় তো অনেকেই অনেক কিছু করে। শ্রীকৃষ্ণের নামই তো হয়ে গিয়েছিল ননি-চোরা। তার তুলনায় গণেশের চুরিটা বলতে গেলে কিছুই নয়, তিনি শুধু একটা মন্ত্রের খানিকটা চুরি করে নিয়েছিলেন। সেই চুরিটা মা দুর্গা ধরতে পেরেছিলেন, সেই জন্যেই ছেলেকে ধমকে তিনি নিজেই সেই চুরি-যাওয়া অংশটা ফের লিখে দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্রটাকেই এখন বলা হয় চৌর-গণেশ মন্ত্র।

গণেশ ঠাকুর যে কাজটা করেছিলেন, শুদ্ধ ভাষায়, তাকে বলে মন্ত্রগুপ্তি। তুমি মনে মনে যদি সংকল্প করো যে, কোনো একটা কাজ তোমায় করতেই হবে, তাহলে সেটা আগে ভাগে কাউকে বলে দিয়ো না। কারণ অন্য সকলে যদি সেটা জেনে ফেলে তাহলে সেটা আর সিদ্ধ হবে না। একেই বলে মন্ত্রগুপ্তি। গণেশ ঠাকুরকে চোর-চূড়ামণি বলার অন্য কারণও কেউ কেউ দেখান। তিনি বিঘ্নরাজ, বিভিন্ন সাধক সাধনা করে যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করেন, সেদিকেও গণেশের নজর আছে। তিনি সাধকদের এই সাধনার ফল চুরি করেন।

কেউ আবার এমন কথাও বলেন, গণেশকে চোর বলা যাবে না কেন, তাঁর পিতা মহাদেব তো চোরেদের সর্দার। সেটা অবশ্য মহাদেবের মন্ত্রে এমনভাবে বলা হয়েছে যে মনে হবে কী সুখ্যাতিটাই না করা হচ্ছে। কেউ আবার বলেন, বাহনের জন্যেই এই অপবাদ। তাঁর বাহন তো ইঁদুর, আর ইঁদুরের স্বভাব কে না জানে। ইঁদুর বা মূষিক শব্দের 'মূষ' কথাটার মানেই হল চুরি করা। কেউ কেউ অবশ্য আর একটা কথাও বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, গোড়াতেই একটু গলদ হয়েছে— এ চোর সে চোর নয়, চোর বা চৌর শব্দের আর একটা মানে হল গন্ধ। সাধারণ ভাবে গন্ধ বোঝাতেও 'চোর' কথাটা ব্যবহার করা হয়, আবার বিশেষ এক ধরনের গন্ধকেও বলে চোর। সবচেয়ে ভালো গন্ধ বলতে আট রকমের গন্ধ বোঝায়— চন্দন, চোর, রোচনা, অগুরু, কস্তূরী, মদ, কুঙ্কুম, আর হ্রীবের।

পুরাণে নির্দেশ আছে, গণেশ পুজোয় এই আটরকমের গন্ধ সমস্তই ব্যবহার করতে হবে। কারণ গন্ধ নাকি গণেশের ভীষণ প্রিয়, তাঁর শরীরও নাকি গন্ধময়। এই জন্যেও হয়তো তাঁকে চৌর-গণেশ বলা হয়।

যেমন ঠাকুর তেমনি বাহন

সব দেবতার ভালো ভালো বাহন আছে— দুর্গার আছে সিংহ, কার্তিকের আছে ময়ূর, বিশ্বকর্মার আছে হাতি, সরস্বতীর আছে হাঁস, আর গণেশের বাহন কিনা ইঁদুর। ওই অত বড়ো চেহারার নাদুসনুদুস ঠাকুর, তিনি কিনা ইঁদুরে চড়ে এখানে-ওখানে যাবেন।

এই অদ্ভুত বাহনটিকে গণেশ জোগাড় করলেন কোথা থেকে। বিভিন্ন পুরাণ এই ব্যাপারে নানারকম কথা বলেছে। একটা পুরাণে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীই গণেশকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। আর একটি পুরাণ বলছে, গণেশ মা দুর্গার কাছ থেকেই এই মূষিক বা ইঁদুরটি বাহন হিসেবে পেয়েছেন।

নিজের সন্তানকে নিজেই তৈরি করার পর পার্বতী তো সেই শরীরে প্রাণ সঞ্চার করলেন। আহ্লাদে উৎফুল্ল দেবী গণেশকে নানারকম খাবারদাবার আর পানীয় ধরে দিলেন। দারুণ সব সুখাদ্য তো, তাই তার গন্ধে কোথা থেকে ছুটে এল এক মূষিক। মা দুর্গা অমৃত পানীয় দিয়েছিলেন গণেশকে, সেই পানীয়তেই চুমুক মেরে দিল ইঁদুর, আর সেই খেয়েই সে হয়ে গেল অমর। তখন গণেশও পরমানন্দে তাকে নিজের বাহন করে নিলেন।

প্রায় সব পুরাণই বলছে, মূষিককে যে গণেশ বাহন হিসেবে পাবেন এ তো জানাই কথা, কারণ মহাদেবের সবচেয়ে প্রিয় পশু হচ্ছে মূষিক। পুরাণে তো এ কথা আছেই, বেদেও এরকম মন্ত্র আছে যেখানে রুদ্র-মহাদেবকে শান্ত করার জন্যে তাঁকে ইঁদুর উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। মূষিককে পেলেই মহাদেব কেন শান্ত হয়ে যান, সে কথাও সেখানে বলা আছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তো জীবসৃষ্টি করেছেন, নারায়ণ করছেন তার পালন, আর মহাদেব হচ্ছেন ধ্বংসের দেবতা, তিনি ধ্বংস করেই এই জগৎ সংসার সব ঠিকঠাক রাখছেন। তো জিনিসপত্র ধ্বংস করার কাজে এই ছোট্ট জীবটিকেও একটি খুদে অবতার বলা চলে। যাবতীয় জিনিস কুচিয়ে শেষ করে ফেলতে তার আর জুড়ি নেই। সেইজন্যেই মহাদেবের ভারি পছন্দ এই জীবটিকে। তাই নিজের সন্তান হিসেবে গণেশ যখন আবির্ভূত হলেন, নিজের অত্যন্ত প্রিয় পশুটিকেই করে দিলেন তিনি তাঁর বাহন।

এখানেও অবশ্য একটা কথা আছে। মহাদেবের নিজের বাহন তো ষাঁড়। যদি ইঁদুরই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হবে, তাহলে তিনি নিজেই তো একে বাহন হিসেবে বেছে নিতে পারতেন, তা না করে ষাঁড়কেই বা তিনি নিজের বাহন করলেন কেন!

এ ব্যাপারে একটা অদ্ভুত কথা আছে বেদে। সেখানে বলা হয়েছে ষাঁড় আর ইঁদুরের মধ্যে নাকি কোনো তফাতই নেই। আসলে একটা সময় নাকি দুটো পশুই এক ছিল— মানে যখন মহাদেব আর গণেশ এক দেহেই ছিলেন। দুজনে যখন আলাদা হলেন তখন তো আর এক পশুই দুজনের বাহন হতে পারেন না, তাই ইঁদুরও আলাদা হয়ে গেল ষাঁড়ের থেকে।

তবে এ সবই তো গল্প কথা, কিন্তু মুশকিল হল পণ্ডিত মানুষদের নিয়ে, তাঁরা তো এসব গল্পের একটা মানে খুঁজে না পেলে সন্তুষ্ট হন না। তাঁদের মনে হয়েছে, গণেশ তো বিঘ্ননাশের দেবতা, সব বিপদই তিনি কাটিয়ে দেন—যে কৌশলে জীবনের সব বিঘ্ন নাশ করা সম্ভব তার সঠিক শিক্ষাটা পাওয়া যায় ইঁদুরের কাছ থেকেই।

ইঁদুর ভারি ছোট্ট প্রাণী। শরীরের মধ্যে তার সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে কান দুখানি। সেটা দেখতে কিন্তু হাতির কানের মতোই, একেবারেই যেন তার ছোট্ট রূপ। ইঁদুরের পা ছোটো, দাঁতগুলি আরও ছোটো, কিন্তু সেই ছোটো দাতগুলিতে খুরের ধার। শস্যের

দানাই হোক, আর পাথরের টুকরোই হোক, নিমেষে টুকরো টুকরো করে দেওয়া ইঁদুরের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। পাথর কেটে কেটেই সে তার নিজের ডেরা বানিয়ে নেয়। মানুষের দাঁতের ক্ষয় আছে কিন্তু ইঁদুরের দাঁতের ক্ষয় নেই। তবে শক্ত জিনিস কেটে কেটে একটু আধটু ক্ষয়ে হয়তো যায় তার দাঁত, কিন্তু সেটুকু আবার পুরণ হয়ে যায়।

কোনো বাধাই ইঁদুরকে কাবু করতে পারে না। যেমন খাটতে পারে দিনরাত, তেমনি তার ধৈর্য, কোনো কাজ ছেড়ে দেয় না ইঁদুর। ইঁদুরকে একটা তুচ্ছ জীব হিসেবে না দেখে, তার কাছ থেকে এই অফুরন্ত উৎসাহ, অসীম শক্তি আর অশেষ ধৈর্যের ব্যাপারগুলো শিখে নেবার কথাই বোধ হয় গণেশ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন।

ইঁদুরই যে গণেশের যোগ্য বাহন, পণ্ডিত মানুষেরা হয়তো একটু অন্য ভাবেও সেটা বুঝিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, গণেশ ঠাকুরের জ্ঞানগম্যি খুব বেশি। মানুষ এত জ্ঞান লাভ করতে পারে না, কারণ জ্ঞানবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে রাখতে চায় ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ আর বেগুণ্য, মানে আসল জিনিসকে ভুল জানা। একসঙ্গে এগুলোকে বলে অষ্টপাশ। মানুষকে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে হলে এই অষ্টপাশের বন্ধন ছিঁড়ে বেরুতেই হবে।

সেটা যাতে মানুষ বুঝতে পারে, এই বাঁধন কাটার চেষ্টা যাতে সে কখনো ভুলে না যায়, সেইজন্যেই নাকি গণেশঠাকুর ইঁদুরকে তাঁর বাহন করেছেন— ইঁদুরকে দেখে যাতে মানুষের সে কথা মনে পড়ে যায়।

গণেশ ঠাকুরের বিয়ে

গণেশ ঠাকুরের বিয়ে নিয়ে আছে নানা গল্প। দুর্গাপুজোর সময় মা দুর্গা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে পৃথিবীতে, মানে বাপের বাড়িতে আসেন, সেখানে দুই ছেলে দুই মেয়ের পাশে গণেশের কলাবউকেও দেখা যায়। কলাগাছকে শাড়ি পরিয়ে বউ সাজানো হয়, নাম দেওয়া হয় কলাবউ, আর বলা হয় এই হচ্ছেন গণেশ ঠাকুরের বউ।

এই গল্পটা একেবারেই বানানো। আসলে মা দুর্গার পুজো শুরু হয়েছিল প্রকৃতিপুজো থেকে; যখন মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়নি, তখন অশ্বত্থ, নিম, বেল এসব গাছকেই মা দুর্গার নামে পুজো করা হত।

অনেক পুরাণেই আছে সে কথা। এটা যাতে আমরা ভুলে না যাই সেইজন্যেই ষষ্ঠীর দিন সন্ধেবেলা বেলগাছের পুজো করা হয়, আর ওই কলাগাছ বা কলাবউয়ের সঙ্গে নবপত্রিকা, মানে আরও আটটা গাছের পাতা বেঁধে দেওয়া হয়; এগুলো হল কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান।

কাজেই কলাবউকে গণেশের বউ না বলাই ভালো।

পুরাণে এরকম কথা আছে যে বিয়ে করব না, এইরকমই একটা সংকল্প নিয়েছিলেন গণেশ। মায়ের সেবা করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। তিনি বসলেন কঠোর তপস্যায় যাতে এই সংকল্পে কোনো বাধাবিঘ্ন না আসে। কিন্তু বাধা দিলেন ধর্মধ্বজের মেয়ে তুলসী। একে রাজকন্যা, তার ওপর দারুণ সুন্দরী। তিনি বিয়ে করতে চান গণেশকে। একদিন সোজাসুজি গিয়ে বলেই ফেললেন সে কথা।

তপস্যা করতে বসেছেন বিয়ে করব না বলে, তখন ভীষণ রেগে গেলেন গণেশ। কিন্তু তুলসীও তো রাজার মেয়ে বলে কথা। তুলসীও রেগে গিয়ে বললেন, কী, এত বড়ো কথা! সারা জীবনে তুমি নাকি বিয়েই করবে না? এই আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, বিয়ে তোমার করতেই হবে। দেখব আমার বদলে কোন শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে নিয়ে আসো তুমি!

গণেশও সহ্য করতে পারলেন না, তাঁর মতো দেবতাকে অভিশাপ! তিনিও রেগে গিয়ে বলে দিলেন, আমিও অভিশাপ দিচ্ছি তোমায়। সুন্দরী বলে বড়ো অহংকার তো তোমার— কোনো দেবতার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, মানুষের সঙ্গেও না। তোমার বিয়ে হবে এক অসুরের সঙ্গে।

সেই থেকে গণেশ আর তুলসী একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। সব দেবতার পুজোয় তুলসী পাতা লাগে, কিন্তু গণেশপুজোয় তুলসী পাতা! নৈব নৈব চ। ওদিকে দুজনেরই অভিশাপ ফলে গেল।

তুলসীর বিয়ে হল শঙ্খচূড় বলে একটা অসুরের সঙ্গে, আর গণেশেরও চিরকুমার থাকা সম্ভব হল না।

কিন্তু বিয়েটা হল কেমন করে? সে গল্পটা জানার আগে আর দু-একটা কথা জেনে রাখা ভালো।

গণেশের বউয়ের মূর্তি আমাদের দেশেও আছে, জাপানেও আছে। জাপানের মন্দিরে তাঁর বউয়ের মূর্তিও গজমুণ্ড। নাম বিনায়কী। কলকাতার জাদুঘরেও বিনায়কীর একটি পাথরের মূর্তি আছে। এই মূর্তিরও হাতির মাথা, চারটি হাত, পদ্মের ওপর বসে আছেন। ডানদিকে ওপরের হাতে তাঁর গদা, নীচের হাতে ঘট; বাঁ-দিকে ওপরের হাতে কুঠার, নীচের হাতে শঙ্খ। ওড়িশায় চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে বিনায়কীর একটি বিগ্রহ আছে।

পুরাণে গণেশের বিয়ের যে গল্পটা বেশ প্রচলিত, দক্ষিণ ভারতেও এই গল্পটাই লোকের মুখে মুখে ফেরে— তাতে কিন্তু গণেশের বউয়ের নাম বিনায়কী নয়। কোনো পুরাণেই বিনায়কীর কথা পাওয়া যায় না। সে না যাক, পুরাণের গল্পটা একটু শুনে নেওয়া যাক।

শিব আর দুর্গা একদিন বিশ্রাম করছেন কৈলাসে, গণেশ-কার্তিক দুই ছেলে হুড়মুড় করে এসে পড়লেন সামনে। কী ব্যাপার, না দুজনেই বলছেন, এত বড়ো হয়ে গেলাম, এখনও বিয়ে দিচ্ছ না কেন আমাদের। কার্তিক বলছেন, তাড়াতাড়ি আমার বিয়েটা দিয়ে দাও। সেই শুনে গণেশ ধমকে উঠে বলছেন, আরে আমি তো বড়ো আমার বিয়েই আগে হবে।

তোমার বিয়ে জন্মেও হবে না। চেহারাটা দেখেছ হ্রদের জলে?

আর তুই তো শিমুল ফুল। বিদ্যেবুদ্ধি কিছুই নেই, কে বিয়ে করতে যাবে তোকে?

বিদ্যেটিদ্যের দরকার নেই, যুদ্ধটা তো আমি ভালো করি, তাতেই হবে। দেখি তুই কীরকম যুদ্ধ করিস! পরীক্ষাটা হয়ে যাক একবার।

শিব দেখলেন মহা বিপদ, ভায়ে ভায়ে লড়াই না বেধে যায়। বললেন, তোমরা এরকম ঝগড়াই যদি করবে তো আমার কাছে এসেছ কেন! আমি যা বলি সেটা আগে শোনো।

দুজনেই মাথা ঠান্ডা করে স্থির হয়ে বসলেন। শিব বললেন, দেখো, তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার একটা পরীক্ষা আমার কাছে দিতে হবে। পরীক্ষায় যে জিতবে, তারই বিয়ে আগে দেব আমি।

তাই হোক। কিন্তু পরীক্ষাটা কী!

শিব বললেন, তোমরা দুজনেই চলে যাও পৃথিবী পরিক্রমা করতে। দুজনের মধ্যে যে প্রথম সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবে, আমরা তার বিয়েই আগে দেব। এই কথা! আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন কার্তিক। তাঁর ময়ূর তো নিমেষে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে উড়ে চলবে। তার তুলনায় গণেশের ইঁদুর। সে তো ওই মোটাসোটা লম্বোদরকে নিয়ে এগুতেই পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন কার্তিক। কিন্তু গণেশের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। শিব বললেন, কী হল, তোমার ভাই যে বেরিয়ে পড়েছে, এবার তুমি রওনা হও।

গণেশ বললেন, শুভ কাজে যাব বাবা, তোমাদের পুজো না করে কি যেতে পারি। তিনি ফুল-বেলপাতা-ধূপ-দীপ দিয়ে মা-বাবার পুজো করলেন, তাঁদের আরতি করলেন, নৈবেদ্য দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সাতবার শিব-দুর্গাকে প্রদক্ষিণ করলেন।

শিব বললেন, এবার যাত্রা করো। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে না?

গণেশ বললেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণ আমার শেষ। একবার নয়, সাতবার। তার মানে?

শাস্ত্রে আছে বাবা, পিতা-মাতাই বিশ্বব্রহ্মান্ড। এ তোমারই কথা। পিতা-মাতা সামনে বসে থাকতে আমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে যাব কোন দুঃখে। তোমাদের সাতবার ঘুরেছি, এতেই আমার সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়ে গিয়েছে।

হার মানলেন শিব। দেখলেন দুর্গা মৃদু মৃদু হাসছেন। শিব যে এই পরীক্ষাটাই করতে চেয়েছিলেন, এটা তিনি অনেক আগে থেকেই জানেন।

কার্তিক ফিরে আসবার আগেই গণেশের বিয়ে হয়ে গেল ঘটা করে। বউ একটি নয়, দুটি—বিশ্বরূপের দুই কন্যা সিদ্ধি আর বুদ্ধিকেই গণেশের বউ হিসেবে বরণ করে নিলেন তাঁরা।

গণেশের গল্প ফুরোল

আমরা মনে করি মা দুর্গার কোলে নাদুসনুদুস গোপালটি, মায়ের সঙ্গে নেমে আসেন পুজোর সময়, মায়ের কোলের কাছে ঘুর ঘুর করেন, শুঁড় উঁচিয়ে দিব্যি বাবু বাবু ভাব দেখান। কিন্তু সেই ঠাকুরের যে কত মাহাত্ম্য— মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, দক্ষিণ ভারত জুড়ে যে তাঁর কত রমরমা, এমনকী ভারতবর্ষের বাইরেও।

বাইরে আর এদেশের সর্বত্র যত কদরই হোক, যে গণেশ ঠাকুর আমাদের ঠাকুর তিনি বড়ো সাদাসিদে ঠাকুর— আমরা তাঁকে নিয়ে মজা করি, ঠাট্টা করি, আবার ভক্তিও করি।

ঠাকুর আবার আমাদের তোমাদের কী? এটা বললাম আসলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গল্পের বইয়ের কথা মনে পড়ল বলে, 'বুড়ো আংলা'। মনে নেই রিদয় বলে ছেলেটাকে, যার নাম আসলে হৃদয়। চিংড়িমাছের কুঁড়োজালি দিয়ে রিদয় বলে ছেলেটা গণেশসুদ্ধু বাহনটিকে ধরতে গিয়েছিল বলে গণেশ ঠাকুরের কী রাগ! তাঁর অভিশাপেই তো রিদয় বুড়ো আঙুলের মতো ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুবচনী ব্রতের খোঁড়া হাসের পিঠে চেপে এদেশ সেদেশ করতে করতে পৌঁছেছিল গণেশ ঠাকুরের দেশে।

এসেও কি স্বস্তি আছে! গণেশ ঠাকুরকে খুঁজতে গিয়ে কী বিপত্তি, এত রকমের গণেশের দেখা পেলে— দারোয়ানরূপী গণেশ, অন্দরমহলের থান ধুতি আর মেরজাই পরা গণেশ, পুঁথিলেখা গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ। শেষে ঘাবড়ে গিয়ে একটা মন্তর বলেছিল রিদয়, তাতেই কেল্লা ফতে। মন্তরটা একটু শক্ত, আমি একটু মনে করিয়ে দিই:

'হুং ভূত স্বাহা, কুরু কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহ্যং কুরু তুভ্যং
হং যং ছট ফট বক্ষবিদ্যা হবিষে স্বাহা অহঃচিটপটাং হুং শান্তি ভূশান্তি
ভূত্যের শান্তি অষুধেঃ শান্তি ছিহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল সূর্য প্রণাম।'

যারা বুঝতে পারছ তারা ঠোঁট চেপে হাসছ। মনে মনে বলছ, এটা কি আর গণেশের মন্তর! এটা মজার মন্তর, কিংবা বলা যায় মন্তরের মজা। আমাদের গণেশ ঠাকুর কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট, যদি অবশ্য তুমি মন থেকে ভক্তি করে বল।

গণেশ ঠাকুরের কথা শেষ করি তাঁর সংস্কৃত ধ্যানমন্ত্র দিয়ে, আমরা অবশ্য বাংলা করেই সেটা বলব:

খর্বতনু স্থূলকায় গজেন্দ্রবদন,
লম্বোদর সুকুমার নয়ননন্দন।
সুগন্ধ মুখের পাশে লুব্ধ অলিকুল
গণ্ডস্থল দুটি যাঁর করেছে ব্যাকুল,
দন্তাঘাতে শত্রুরক্তে লাল অঙ্গ যাঁর
পার্বতীনন্দন, নাম গণপতি তাঁর।
সর্বকর্মে সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধ মনস্কাম,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, তাঁকেই প্রণাম।

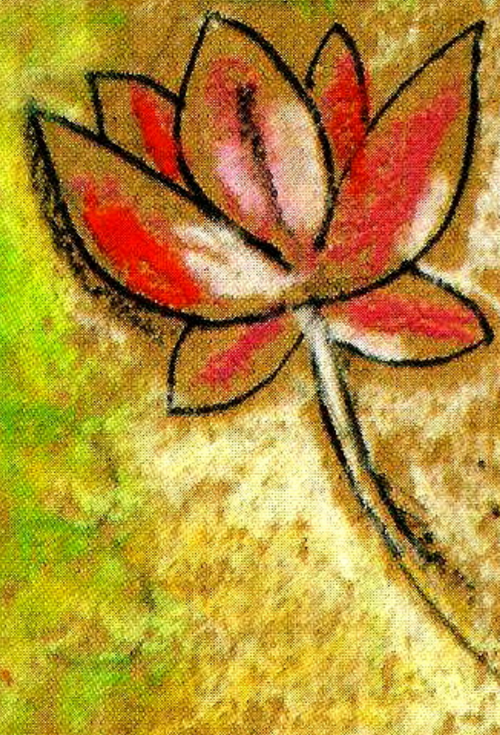

শিশু সাহিত্য
সংসদ

INR 75.00

ISBN 81-7955-174-1
9788179551745